MAHISHADAL RAJ COLLEGE STUDENTS' UNION
"বন্দেমাতরম"
অমিত্রাক্ষর
বর্ষপত্র - ২০১৮-১৯
ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ

স্বর্গীয় কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা
মহিষাদল রাজ কলেজ

অমিত্রাক্ষর

বর্ষপত্র- ২০১৮ - ২০১৯

মহিষাদল রাজ কলেজ

মহিষাদল ★ পূর্ব মেদিনীপুর

উপদেষ্টা

ড. অসীম কুমার বেরা

অধ্যক্ষ, মহিষাদল রাজ কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

শুভময় দাস

সম্পাদক (পত্রিকা বিভাগ)

সায়ন আচার্য্য

প্রকাশক:
প্রকাশ পাল
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

প্রকাশকাল :
৩০শে জানুয়ারী, ২০১৯
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুদ্রক :
সৃষ্টি ডি.টি.পি সেন্টার
ধারিন্দা রেল ক্রসিং, তমলুক
মোঃ-৯১২৬৫৬৪৭৫২/ ৯৮০০৪৯১৫৫৬

" আজ তুমি কতদূরে.....
মুছে গেছো মনে, নেই কাছে তবু আছো
ব্যাথাভরা স্মরনে...."

আমাদের ছাত্র সংসদের ১৯৮৪-৮৫
এবং ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন সাধারণ
সম্পাদক - শ্রদ্ধেয়

ঁঅমল কুমার মাজী

মহাশয়ের অকালপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে
শোকাহত। উনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ

সেই সব প্রাক্তনী গুণীজনকে-

যাঁরা বিগতদিনে অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে আদর্শকে পাথেয় করে তরুণ জীবনের বহু প্রলোভনকে তুচ্ছ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে ছাত্র সংসদের দায়িত্ব নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে পথ হেঁটেছিলেন...

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা অনেকেই আজ কিছুটা ব্যস্ত হলেও কখনো ভুলে যাননি তাঁদের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মহিষাদল রাজ কলেজকে...।

মুখবন্ধ

মহিষাদল রাজ কলেজ মহিষাদলের গর্ব। এই কলেজের সুনাম কেবল দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জেলাকে ছাড়িয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এবং আমাদের কলেজে প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের দৌলতে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিদেশে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালের NAAC (National Assessment and Accreditation Council)-এর মূল্যায়ণে আমাদের কলেজ **'A-Grade'** পেয়েছে। এই গৌরব দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় মাত্র পাঁচটি কলেজ এখন পর্যন্ত অর্জন করতে পেরেছে। এই বিরল গৌরব অর্জনের জন্য আমি সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রসংসদ, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দকে, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

মহিষাদল রাজ কলেজ বর্তমানে বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মতো শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গন খুলে দিয়েছে। এই কলেজে এখনও পর্যন্ত সাতটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাস (P.G.) পড়ানো হচ্ছে। NAAC কমিটির সুপারিশ অনুসারে আরও কয়েকটি স্নাতকোত্তর বিষয় ভবিষ্যতে পড়ানো হবে। কলেজে তিনটি Career Oriented Course পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। যার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা সহজে চাকুরী পেতে পারে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা (B. Voc.) Automobile ও Health Care পড়ানোর ব্যবস্থাও আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের কলেজে Geology (Hns. & Gn.), Disaster Management (Gn.), N.C.C. (Gn.), Military Science (Gn.) প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ানো হয়।

মহিষাদল রাজ কলেজের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার একজন অন্যতম শরিক হল ছাত্র-সংসদ। কলেজের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন ও ছাত্র কল্যাণে তাদের সারা বছরব্যাপী সক্রিয় কর্মোদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাদের নানা কর্মোদ্যোগের একটি অন্যতম প্রয়াস হলো বার্ষিক পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর'-এর প্রকাশ। এই 'অমিত্রাক্ষর' ছাত্র-সংসদ-এর দর্পণ। তাদের সারা বছরের কর্ম প্রচেষ্টার খতিয়ান প্রকাশ পায় এই পত্রিকায়।

তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সতেজ প্রাণের আবেগ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে 'অমিত্রাক্ষর'-এর প্রত্যেক পৃষ্ঠা। ছাত্র সংসদের পত্রিকায় হাত পাকিয়েই এই কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্র আজ যশস্বী হয়েছেন। তাই আজকের 'অমিত্রাক্ষর'-এর নতুন কবি লেখকেরা যে আগামী দিনের যশস্বী কবি লেখক হয়ে উঠবে না, তা কে বলতে পারে? ছাত্র-ছাত্রীদের তরুন মনের লেখার এই প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।

'অমিত্রাক্ষর' আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। আমি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

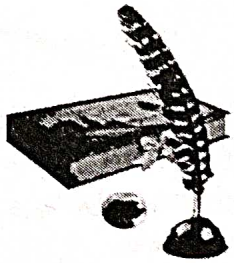

ডঃ অসীম কুমার বেরা
অধ্যক্ষ
মহিষাদল রাজ কলেজ

পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

এই মুহূর্তে অমিত্রাক্ষর শব্দটা যেন জিভে গেঁথে আছে। না ঠিক জিভে নয় মগজে গেঁথে আছে। তার সঙ্গে হৃদয়ে এবং সারা গায়ে সেঁটে আছে। কিন্তু সারা বাংলায় তো কলেজ ম্যাগাজিনের কোও অভাব নেই তবুও ম্যাগাজিন বললেই যেন বোঝায় অমিত্রাক্ষর। ঠিক যেমন পাহাড় বললেই দার্জিলিং - লোনা জল বললেই যেমন দিঘা- আর সবুজ বললে জঙ্গলমহল। লালমুখোরা ভারত ছেড়েছে সেই কবেই। ার প্রায় প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখা শুরু হয়ে গেছে। শুরু হল কুয়াশা থেকে আলোর মুক্তি পাওয়া। মুক্তির নেশায় ছেলেমেয়েরা স্বাধীনোত্তর যুগে বল্লম ফেলে এখন তুলে নিয়েছে কলম। হাতে তাদের কলম তুলি আর বাঁশি। আঁকছে তাদের শব্দছবি। সেই ছবি আঁকবার ক্যানভাস হল আমাদের অমিত্রাক্ষর। ওটা যে কতটা উঁচুমানের উঁচুদরের ও উঁচুমনের তাঁর পরিষ্কার আন্দাজ পাওয়া ভারী শক্ত। তবুও আমি গর্বিত দ্বিতীয়বারের জন্য এই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে থাকতে পেরে যতটা তার থেকেও অনেক বেশি আবারও অমিত্রাক্ষরের পাতায় কলম ছুঁতে পেরে। সেই কবে থেকেই অমিত্রাক্ষর ছুঁয়ে ছুঁয়ে বসে আছি। অনুভব করি তার হৃদয়ের ধুকপুক আর পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন। সারাদিনের - সারাবছরের ক্লান্তিকর পাহাড়ি রাস্তায় হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো এঁকে বেঁকে চলতে চলতে হঠাৎ অমিত্রাক্ষর যেন একটা ম্যানল যেখানে দুদণ্ড মন খুলে পসরা সাজিয়ে বসা যায়! উফ কি ঘন সবুজ রং! এই অমিত্রাক্ষর কী গভীর! ওপরের দিকে তাকাই। বাব্বা কি উঁচু! কি উঁচু উঁচু গাছ! গাছেদের আলো না হলে চলে না। চারপাশে বাড়বার জায়গা তো নেই। অথচ এই ছেলেমেয়েদের এরই মধ্যে বেড়ে উঠতে হবে। বাড়াতে হবে চারপাশের পাশের দিকে এবং ওপরের দিকে তো বটেই। আরও পরের দিকে বারবার জায়গা হল আকাশ। আকাশ হলো আমাদের মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক পঠনপাঠন আর পাশের দিকে বাড়বার পরিসর হলো আমাদের এই অমিত্রাক্ষর। আমি নিশ্চিত বাড়তে বাড়তে আমার ছেলেমেয়েরা মেঘেদের সঙ্গে কথা বলবে- স্বপ্ন দেখবে। ওরা স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখুক। ওরা সৃষ্টিশীল হোক। সৃষ্টিশীল স্বপ্ন সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখুক। সত্যকে নিংড়ে জীবনে প্রয়োগ করার স্বপ্নও সার্থক করুক। দীর্ঘায়ু হোক - সুস্থ থাক অমিত্রাক্ষর। আরও বড় হোক কলেবরে। আরও বড় হোক গুণমানে।

অভিনন্দন সহ

তিলক কুমার চক্রবর্তী

সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি

মহিষাদল রাজ কলেজ

Message from the Bursar

I am extremely happy to know that the Students' Union of our college is bringing out their annual magazine "AMRITAKSHAR" for the academic session 2017-2018. The college magazine is a forum which could aptly be used for recording events, fond memories and creative writing. I am sure that this magazine will be informative and resourceful. I hope that the magazine will bring creative talents of the students and staff of the college.

I convey my good wishes to the editors and the members of the editorial board.

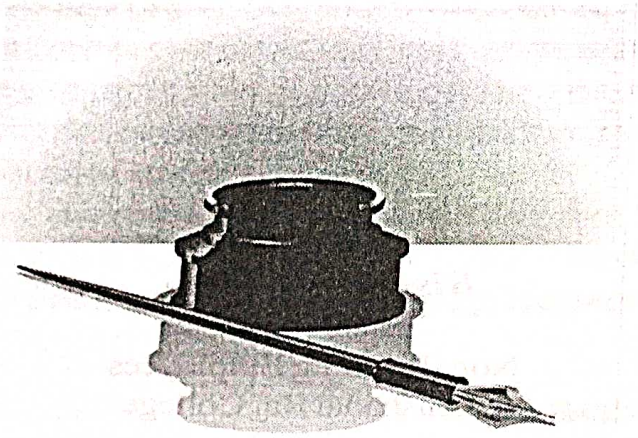

Prof. Badal Kumar Bera
Bursar
Mahishadal Raj College

MESSAGE

I am extremely happy to knwo that the Students' Union of our college is bringing out their annual college magazine 'AMRITKSHAR' during this year. In addition to the numerous achievements of the college this is yet another milestone in their curricular and co-curricular activites. I hope the magazine will bring creative talnts of the students of the college
I wish them all success.

Biswajit Ghosh
Secretary
Non-Teaching Employees
Mahishadal Raj College

শুভেচ্ছাবার্তা

বছর বছর জানুয়ারি এলে নতুন নতুন প্রচ্ছদে অমিত্রাক্ষর তার পাখনা মেলে। মেঘ হয়ে পাহাড়ের বুকে লেপটে থাকে অমিত্রাক্ষর। কিংবা পাহাড়ি ঝোরার প্রেম ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাফিয়ে ডিঙিয়ে চলে ছলাত ছল। কখনও বা মেঘ কেঁদে চলে আঁধার রাতে। ডিজে একসা চুপিসাড়ে বন পাহাড়। অমিত্রাক্ষর মহিষাদল রাজ কলেজের মেঘ মুলুকের স্বপ্ন। সবার মনের মেঘ কখনও বৃষ্টি কখনও জল! কখনও বা শিলা তুষার হিমকণা। অমিত্রাক্ষর মেঘের মতো। ওখানে সারাদিন ধরে কত খেলা! কত স্বপ্ন! কত স্বপ্ন ভঙ্গ! এ কখনও গেঁড়ির মতো হামা দিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে গুঁটি গুটি । কখনও ওদের সবপ্ন ভেড়ার পালের মতো পাহাড়ের গায়ে দল বেঁধে বিশ্রাম করে। কখনও বিশাল দৈত্যের মতো উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির আড়াল করে বিদ্রোহ করে- প্রতিবাদ করে- সূর্যকে ঢেকে ফেলে! অমিত্রাক্ষর কাঁচা অথচ ধারালো লেখা কখনও কখনও ভারী ভারী মেঘ মণ্ডলের মতো অনায়াস জল ঢেলে আমাদের বড়দের দেশ ভাসিয়ে দেয়। ওদের ভাবনার দেশ যখন আমাদের প্রতিষ্ঠিত ধারণা ভাসিয়ে দেয় তখন তাদের এক একটা মেঘ যে কত উঁচু আর কত গভীর আর তা যে কতটা জল দায়ী তা বোঝা যায় মাঝে মধ্যে। এমনিতেই অমিত্রাক্ষর দিনের হাল্কা মেঘের মতো প্রেমময়। তবুও সমাজের হিম লেগে ওই মেঘে। মাঝেমধ্যে জমে থাকে খাঁজে অন্দরে। তখন তাদরে ঘুমের কথা মনে হয়। পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে মেঘ। অমিত্রাক্ষরের আলোর রোদের একটা আলাদা জ্যোতি আছে। শহুরে ধুলো মাখা কলেজের মেকি মেকআপের মধ্যে আমি দেখতে পাই না ওই জ্যোতি। আমার সন্তানদের মনের বোধের দরবারি কানাড়া খেলা করে অবিরাম এই অমিত্রাক্ষরের উঠোনে। এই রোদের ঘেলা যে একবার দেখে সে ভোলে। কোনও জন্মেও। যদি কেউ ভোলে সে বড় দুঃখী লোক।

অমিত্রাক্ষর তার পাতার রোদের রং বদলাতে থাকে। কখনও মিছরির ঢেলা - কখনও আগুনের গোলা বা কখনও মুক্তো! কিংবা গরদের উপর চাঁদির কাঁজ এ যেন জাদুকরের ভেল্কি! এ যে ঠিক কেমন সুন্দর তার তুলনা কোথাও নেই।

তবু তো রাত্রি নামে! যদিও আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ তবু তো অন্ধকার অন্ধকারই। এখনও বিজ্ঞান বিভাগ মুখ ফিরিয়ে আছে। প্রবন্ধ হাহাকার তোলে। কবিতাও তেমনি সবল সুস্থ নয়। বড্ড টিম টিমে। গল্পেরা চরিত্র হারিয়ে জৌলুসহীন। বড় গল্প নেই। উপন্যাস নেই। ছোট গল্প নেই। এখন অনু পরমাণু গল্পের যুগ। বেশি পড়বার বেহিসেবি সময় কোথায়? তবুও লেখা থালে পড়ার লোকের অভাব হয় না। তবু অনেক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকি বছরভর। সূর্যের পরিক্রমা একসময় শেষ। হয় তবুও এই ই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় কালো কালো অক্ষর কাঁচাকাঁচা কাগজের গন্ধের বুকে লেপটে থাকা আপ্রান চেষ্টা করে। যদিও টিকে থাকা সত্যিই দুষ্কর। তবু বলি, সত্যি হোক মিথ্যে হোক এ বড় সুন্দর।

এ বছর পত্রিকাকে ই ভার্সন করার ইচ্ছে আগে বিগত বছরের মতো। ছাত্রছাত্রীদের কলমের স্রোত আমার কলমের ডগা দিয়ে ভিন্নমুখী করতে চাইনি। স্রোত যদি যেমনি ছিল ঠিক তেমনটি রাখলাম হুবহু। বহু বছর পরে নিশ্চিত কেউ কেউ উল্টে দেখবে তার আগুনে পোড়া ইতিহাসকে। কলেবরে বাড়ুর অমিত্রাক্ষর। দীর্ঘায়ু হোক অমিত্রাক্ষর।

শ্রী অধ্যাপক শুভময় দাস

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

ছাত্রসংসদ

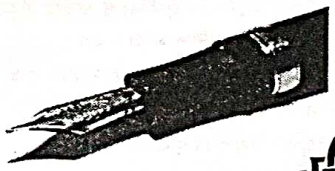

সূচিপত্র

দায়িত্বপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্পাদকের কলমে - সায়ন আচার্য্য - ১১
''শেষের পাতায় বিজ্ঞান পরিষদ'' - দেবাশীষ আচার্য্য-১২
সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ - নিলাদ্রী মণ্ডল - ১৩
ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে - সব্যসাচী পণ্ডা -১৫
সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে - প্রশান্ত বেরা - ১৭
ছাত্র কল্যাণ বিভাগের সম্পাদকের কলমে - মেহেবুব সোহেল বেগ, দেবাশীষ নায়েক - ১৮
পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে - কমলজিৎ দাস - ১৯
হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে - প্রকাশ পাল - ২০
এমি নোয়েথার : এক অনন্য জীবন - নবব্রত ঘোষাল - ২২
সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ - সমির কুমার পাত্র - ২৬
মানুষ ও শিক্ষক লালজি সিং ভারতীয় ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর জনক - অধ্যাপক শুভময় দাস - ২৮
''সভ্যতার সংকট'' - অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায় - ৩১
কন্যাশ্রী প্রকল্প - কৃষ্ণকলি বর্মন - ৩৩
এক নির্জন অন্ধকার রাত - বিশ্বজিৎ সাঁতরা - ৩৬
মরোনোত্তর দেহদান - সৌরভ সাহু - ৩৮
Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -পল্লবি দাস - ৪০
Sea horse ও তার বাচ্চা প্রতিপালন - মৌসুমি ঘোড়ই - ৪৩
সভ্যতার অগ্রগতি — আধুনীকরন - তমালিকা দাস - ৪৪
মজাদার জুলোজি - সুরেখা চৌধুরী - ৪৫
প্রসঙ্গ হাই তোলা - সাগ্নিক মন্ডল - ৪৬
কে তুমি - রাজু সর্দার - ৪৭
চিত্র শিল্প চর্চার প্রয়োজনীয়তা - প্রীতি সাঁতরা - ৪৮
আধুনিকতার আড়ালে - সুস্মিতা সাহু - ৪৯
নারী শক্তি - বনশ্রী খাঁড়া - ৫০
'আমি, সে ও সখা' - রাজেশ মানিক - ৫১
নারী শক্তি - উপাসনা মান্না - ৫২
হারিয়ে ফেলা - ভানুমতী রায় - ৫৩
কলম কথা - দীপেশ জানা - ৫৩
সমাজ - প্রশান্ত বেরা - ৫৩
জীবনকে ভালোবাসো - অনামিকা ব্যানার্জী - ৫৪
ফেরারী মন - দীপেশ জানা - ৫৪
বন্ধু তোর জন্য - শুভজিৎ কুইল্যা - ৫৪
শীতের শোভা - মধুমিতা উথাসিনী - ৫৫
পড়ার ছড়া - বিষ্ণুপ্রিয়া কুইল্যা - ৫৫
ইউনিয়ন - সুদীপ মান্না - ৫৫
তুমি শুধুই তুমি - সুমঙ্গল মান্না - ৫৬
মা - শিউলি সাউ - ৫৬
স্মৃতি - অর্পিতা কুইলা - ৫৬
শীতকাল - মৌসুমী জানা - ৫৭
শোকাহত- স্বস্তিকা মন্ডল - ৫৭
আমি দরিদ্র - দেবাশিস আচার্য্য ৫৭
স্বপ্ন - সুপ্রিয়া পতি - ৫৮
সুখ ও দুঃখ - বর্ণালী ঘড়া - ৫৮
মেঘ - শিউলি দাওয়া - ৫৮
ঋতুপুষ্প - রিয়া চক্রবর্ত্তী - ৫৮
রাজ কলেজ - সম্পা সিংহ - ৫৯
মনে পড়ার দিন - শিখা হাইৎ - ৫৯
এই আমাদের দেশ - দীপা ভৌমিক - ৫৯
বন্ধু - সঙ্কিতা পাত্র - ৬০
জীবন - মহুয়া ভৌমিক - ৬০
শুধু তোমারই জন্য - অনন্যা ভৌমিক - ৬০
গোড়ার কথা - মৌসুমী ভূঞ্যা - ৬১
মনের পাখি - সেক্ আসপাক আহমেদ - ৬১
অরন্য - বর্ণালী সাহু - ৬১
রূপকথার দেশ - পায়েল বেরা - ৬১
বৃষ্টি - সুদীপা বারিক - ৬২
হৃদয় চারিনী - সুশমা মাইতি - ৬২
ঋতুর ধারা - কুহেলী সাউ - ৬২
কবিতা বাড়ি - ৬৩
হয়তো তোমারি জন্য - পৌষালী সামন্ত - ৬৩
ঘুম - কৃষ্ণকলি বর্মন - ৬৩
স্বপ্ন - সুরজিৎ নায়েক - ৬৪
আমার ভাবনা- সঙ্কিতা জানা - ৬৪
ভালোবাসি- সুমন ভূঁইয়া - ৬৪
বন্ধুত্ব - প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক - ৬৫
হঠাৎ সেই দেখা - লাবনী দোলুই - ৬৫
সাধ - শুভজিৎ পাত্র- ৬৫
শীতের সকাল- চুমকি মুর্মু - ৬৬
আমাদের ম্যাগাজিন - মধুশ্রী জানা - ৬৬
আবেগপুঞ্জ - শুক্লা হাজরা - ৬৬
কলেজ- সমীর কুমার দাস - ৬৬
মহাবিদ্যালয়ের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা - পার্বতী মাইতি - ৬৭
আলো - সুপ্রীতি দাস - ৬৭
কবিতা লেখার শখ- অনিমা দাস - ৬৮
''এমন ও কোনো দিন যায়নি'' - রাহুল প্রামানিক - ৬৮
ব্যর্থ ভালোবাসা - ত্রিয়াশা সামন্ত - ৬৯
BE A FRIEND - *Saheli Nayek - 70*
Divine Love - *Debika Basu - 70*

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

দায়িত্বপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্পাদকের কলমে

অমিত্রাক্ষরের অমৃত বানীতে মোড়া আমার Department আমার মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা যখন আমি প্রথম নতুন জীবনের আস্বাদে মোড়া College মন্দিরে প্রবেশ করি। আমি তখন দিশেহারা পথিক-এর মতো অথবা মহাসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোনো জাহাজের মতো হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় যাব কি করব কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। হঠাৎ মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো একটা Platform পেলাম সে হল ভালোবাসার ও স্নেহের বেড়াজালে ঘেরা ছাত্রসংসদ, এই মরুদ্যানের খোঁজে আমার গুরু ছিলেন মেহেবুবদা। তারপর আমি যেন মায়ায় আর দাদার ভালোবাসায় নিজেকে নতুন রঙে সাজতে দেখেছি। আর সবুজ ঘরের দাদারা আমায় নতুন ভাবে গড়তে শিখিয়েছে। তাই তাদের অনেক আশীর্বাদের মধ্যে একটার কথা আজ বলছি তা হল আমার 'পত্রিকা সম্পাদকের আসনে আমার নামটা লিখেছেন, আমি অবাক হয়ে যাই আর রীতিমত না জানার অসুখে ভুগতে থাকি। আমি কিছুই জানতাম না এই বিষয়ে তার পর আরও একবার দাদারা আমার মাথায় হাত রাখলো, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাম। আজ আমি প্রায় আমার দায়িত্ব পূরণ করে ফেলেছি। দেবাশীষদা, উত্তম দা ও বিক্রম দা এছাড়া প্রকাশ এদের কৃতিত্ব রয়েছে এছাড়াও অন্য দাদাদের সাহায্যে আমি আজ আমার পত্রিকায় শেষ লেখনি নিজের অভিজ্ঞতা লিখতে বসেছি। লেখার পথে অনেক দাদা তার অভিব্যক্তায় আমাকে ভরিয়ে তুলেছে। বাপ্পাদিত্য দা-র কথাও যে না বলে থাকতে পারছিনা আর আমার এবং সকলের প্রিয় শুভময় বাবু, যাঁর অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের পত্রিকার সমস্ত রকম ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছেন। হ্যাঁ প্রথমদিকে পত্রিকার Volume নিয়ে সমস্যা ছিল পারবতো কিন্তু অনেক ছোটাছুটি এবং আমার প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী স্বরূপ ভাইবোনরা আমায় নিরাস করেনি, করেনি নিরাস আমার বন্ধুরা এবং দাদারা। তাই আজ আমি আমার দায়িত্ব প্রায় ভালোভাবেই পূরণ করেছি।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ—

সায়ন আচার্য্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্পাদক

"শেষের পাতায় বিজ্ঞান পরিষদ"

দেখতে দেখতে কলেজ জীবনটা প্রায় শেষের পথে কিন্তু এই মন্দিরের মহিমা এবং এই মন্দিরের পূজারী সরূপ ছাত্রসংসদ এবং শিক্ষকদের ভালোবাসায় মোড়া স্মৃতি নিয়ে হয়তো আমার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। আমাদের প্রিয় শুভময় বাবু যখন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, বলেছিলেন যে এখানে আমি স্বয়ং নিজের অভিভাবক কিন্তু এটা ঠিক না ভুল এখনও বুঝতে পারিনে কারণ ছাত্রসংসদ আমায় এতোটা ভালোবাসা এবং স্নেহের বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছে যে কখনও অভিভাবকের খামতি মনে হয়নি। যাই হোক এতদিন শুধু পড়াশোনার মধ্যেই জীবন সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু দাদাদের আশীর্বাদে পেয়েছি একটা কর্তব্য বা দায়িত্ব 'আমি এখন সবুজ ঘরের বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক' কথাটা খুবই গর্বের আমার কাছে, আমি কৃতজ্ঞ যে দাদারা শুধুই আমায় গড়তে সাহায্য করেনি তারা আমায় দায়িত্বপরায়ন হতে শিখিয়েছে। কতই না ভুল করেছি কিন্তু দাদারা আমায় চিরদিন সঠিক পথে এনেছে, সঠিক রাস্তা দেখিয়েছে। এবার বলি আমার বিজ্ঞান পরিষদের কথায় বঙ্গোলির রঙে রাঙানো আমার বিজ্ঞান পরিষদ। এছাড়া ক্যুইজ, তাৎক্ষনিক বক্তব্য, যা কিনা আমাদেরকে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজের সত্বা টিকিয়ে রাখতে শেখায় তাছাড়া সংবাদ পাঠ এবং অঙ্কন এদের কথা না বললেই নয় শিল্পী যেমন করে প্রকৃতিকে ছোট্ট খাতায় বন্দি করে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখায় আমাদের ঠিক তেমনি আমার সবুজ ঘরের ছবি আমার হৃদয়ের ঘরে আঁকা রয়েছে। আমি শিল্পী নাই যে তা দেখাতে পারব বা এর মহিমা এতই বড় যে ছোট্ট খাতায় রাখা অসম্ভব। তাই তৃণমূল ছাত্রপরিষদকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে স্বাগত জানালাম আমার লেখনির মধ্য দিয়ে।

দেবাশীষ আচার্য্য
দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞান পরিষদ সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ

প্রিয়, সবুজ সাথী, প্রথমেই ছাত্র-সংসদের পক্ষ থেকে বর্তমান বৎসরের সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোন, দাদা-দিদি, অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সকল শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা ও আমার হৃদয়ের আঙ্গিনার একরাশ ভালোবাসা,

আমাদের মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র-সংসদে প্রতি বছর একটি বর্ষপত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হয়। তাই আজ আমি মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র-সংসদের খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কমনরুম সম্পাদকের দায়িত্বে থাকায় বর্ষপত্রে লেখার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে খুবই ভাগ্যবান, আনন্দিত ও গর্বিত বোধ মনে করছি। আমার বিদায় মূহুর্ত আসন্ন। তাই যাওয়ার আগে অনেক ভালোমন্দ স্মৃতি নিয়ে আমার শেষ লেখাটুকু লিখে গেলাম।

আর না-আসিব আমি তোমারই মনে
ব্যর্থ হয়ো না যেন, তুমি আমাকে খুঁজে,
আমি চলে গেলে আসিবে নতুন জন
তারে তুমি করে নিও একান্ত আপন।।

কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পন স্কুল জীবন ছেড়ে কলেজ জীবনে আগমন। ২০১৬ সালে 'মহিষাদল রাজ হাইস্কুল' থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর মা বাবার স্নেহভরা আর্শিবাদ নিয়ে 'শিক্ষাবিজ্ঞান' বিভাগে স্নাতক নিয়ে হাজির হলাম এই কলেজের অঙ্গিনায়। সবকিছুই যেন ছিল তখন অচেনা/অজানা। চিনতাম শুধু দুজন দাদাকে। সুরেন্দু দা ও রোহিত দা, কলেজ জীবন শুরুর প্রথমেই যেই দাদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেই রোহিত দাকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

ছাত্র-সংসদ প্রথমে কি জানতাম না, আসতেও চাইতাম না, এসেছিলাম একজন প্রিয় মানুষের ভালোবাসার টানে, যার জন্য আজ আমার এতোটা পরিবর্তন আমাদের সকলের নয়নের মণি 'উত্তম দা' কে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তারপর থেকে, এই সবুজ ঘরটাকে আপন করে নিতে শুরু করলাম। দাদাদের সাথে কাজ শিখতে শুরু করলাম, সময়ের অবকাশে কাজের দিনগুলি কাটিয়ে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-সংসদের দাদারা আমার ওপর সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'বিশ্রাম ও আলাপন' বিভাগ-এর সম্পাদক পদটি অর্পন করেন। আর ভালোবাসার বাঁধনে সবুজ ঘরটার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম ও তিনটি মন্ত্রে দীক্ষিত হলাম- শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম। আর সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ৩৬৪ দিন ছাত্র-ছাত্রীদে সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকবো। Principal মহাশয়ের কাছে গিয়ে আমার ছাত্র-সংসদের 'ডেপুটেশন'-এর ফলে এবছর নতুন একটি TT বোর্ড Boy's Common রুমে নিয়ে আসতে পেরেছি। ছাত্রদের ক্যারাম খেলার জন্য চারটে লোহার নতুন স্ট্যান্ড-এর সু-ব্যবস্থা করতে পেরেছি। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের একটাই অনুরোধ করবো জিনিস গুলো তোমাদেরই জন্য করে দেওয়া একটু যত্ন সহকারে রেখো, জানি না, তোমাদের জন্য কতটা কী করতে পেরেছি। কতটা সাহায্যের হাত দিয়েছি বাড়িয়ে। আগামী উত্তরসূরী হিসাবে এই বিচারের দায়িত্ব তোমাদের। আমার জন্য কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে বা অভিমান হলে ক্ষমা করে দিও। ভুলগুলো নিয়ে সামনের বছরটাকে খারাপের ছায়ালিপ্ত করো না। নিজের অজান্তে যদি কোনো আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শেষ বেলায় আমার আর কিছুই বলার নেই, নেই আর মনের ভেতরে গভীরে থাকা কথা। যেমন সকলের সাথে

হাসি-খুশিতে মিশে এসেছি তেমনই সারাজীবন আমি হাসি মুখে থাকবো। অনেক কথা, অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এবার দায়িত্ব ছাড়ার সময় এসে গেছে, এবার আমার অতিথির মতো বিদায় নিতে হবে। আর এই যে বিদায় হচ্ছে বিচ্ছেদ, আর প্রত্যেক বিচ্ছেদের মাঝেই থাকে নীল কষ্ট। কেন জানি না, চোখের এক কোনে আজ জল এসে গেলো। আসবেই না বা কেন, কারন এই সবুজ ঘরটা যে আমাদের 'মা' এতদিন মায়ের নাড়ির সঙ্গে যে বন্ধন ছিল, সেটি যে আজ ছিন্ন হল। সেই সবুজ ঘরটা যে আমাকে ভালোবাসা আর সম্মান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল। তবুও বলছি তোমরা সারা জীবন আমায় মনে রেখো। আমার আনন্দের সঙ্গী হয়ে থেকো। চিরকাল আমার পাশে থেকো, আগামী দিনের চলার পথে সুখ শান্তির নীড় হয়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাবে। আর তখনই ভেসে উঠবে তোমাদের থেকে পাওয়া বুকভরা ভালবাসার সুন্দর অতীতগুলো।

সবশেষে বলি, প্রকৃতি এবং বিবেক এই দুই শক্তি কে একত্র করে তোমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। প্রকৃতি যেমন তার নিয়মের বাইরে কাউকে যেতে দেয় না। তেমনি বিবেকও মন্দ কাজে তোমাকে পা বাড়াতে দেবে না। বিবেককে পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অনুরোধ করবো সবাইকে তেরেঙ্গা পতাকার সাথে সাথে শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। জীবনে ভালো মানুষ হও। সবাই ভালো থেকো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সকলে সুস্থ ও ভালো থেকো। তোমাদের জীবনে চলার পথ মসৃণ হোক এই শুভ কামনা করি। পরিশেষে সকলকে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিন্দাবাদ। মা-মাটি-মানুষ জিন্দাবাদ। নমস্কার। সেলাম।

"বন্ধুদেরই এই আসরে আজকেই যে শেষবার,
কালকে থেকে তোদের মাঝে রইব না রে আর
চলে যাব অনেক দূরে,
যদি দেখিস পেছন ফিরে,
দেখতে পাবি তোদের মনে,
লুকিয়ে আছি ছোট্ট কোনে,
হয়ে একটু মিষ্টি হাসি,
মনের মাঝের একটু খুশি
কখনো বা আসবো হয়ে চোখের কোনের জল,
সেদিন আমায় কে চিনবি বলরে তোরা বল।।"

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ

নিলাদ্রী মণ্ডল

সম্পাদক

(দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ)

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

(১)

* মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বেড়েছে ব্যস্ততা। মানুষ তার জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সব সময় হচ্ছে ক্লান্ত। প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে অধিক সাফল্যের পেছনে। মানুষের এই কর্মময় জীবনে তাকে একটুখানি বিরতি এনে দেয় খেলাধুলা। জীবনের সাথে সংগ্রামরত মানুষকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য জীবনকে উপভোগ করতে শেখায় এই খেলাধুলা। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলা একদিকে মানুষকে যেমন শক্তি ও সাহস দেয় অন্যদিকে তা প্রেরণার উৎস। নিয়মিত ও পরিমিত খেলাধুলা মানুষকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী করে। খেলাধুলার জয় পরাজয় থেকে মানুষ খুব সহজে জীবনের জয়-পরাজয় গুলোকেও মেনে নিতে শেখে।

(২)

* অতীতকাল থেকেই মহিষাদল রাজ কলেজে ছাত্রসংসদের পরিচালনায় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বর্তমানকালে যদিও বিনোদনের হাজারো উপাদান - উপকরন সৃষ্টি হয়েছে তবুও খেলার অবদান এতটুকুও কমেনি। খেলাধুলা মানুষকে আনন্দ দেয়, উচ্ছ্বাসিত করে তোলে। মহিষাদল রাজ কলেজে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলার আগের কিছু দিন Union-এর G. S. থেকে আরম্ভ করে কলেজের Principal মহাশয় ও শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী মহাশয়াদের Union-এর পক্ষ থেকে কার্ড দেওয়া হয় Union-এর আগের পুরোনো মেম্বারদের ডেকে আনা হয় ওই Sports-এর দিন।

(৩)

* খেলা যে আমাদেরকে শুধু বিনোদন দেয় এমন নয় বরং আমাদের পুরোনো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী, Union- মেম্বারদের একত্রিত করে ওই দিন। একটা মেল বন্ধন তৈরি হয় সবার সাথে। এমনকি নতুন বছরের ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, সহযোগীতা ও আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে এই খেলাধুলো। খেলাধুলো মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি করে তাদেরকে একটি সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রত্যেকটি খেলার কিছু নিয়মকানুন থাকে, খেলাধুলো করতে হলে সেসব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। মহিষাদল রাজ কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি, সারা দিন ধরে যিনি কঠোর পরিশ্রমে এতো বছর ধরে করেছেন সেই সুশান্ত বাবুকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি যদি না থাকতেন আমরা খেলাটাকে প্রতি বছর সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে পারতাম না। স্যার যেন ছাত্রদের সাথে ঐক্য তৈরি করে ফেলেন তাড়াতাড়ি। অতীতকাল থেকেই মহিষাদল রাজ কলেজে ছাত্রসংসদের আয়োজনে যে সমস্ত খেলাধুলো হয়ে চলেছে যেমন — ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, প্রভৃতির ফলে সঠিক খেলোয়াড়দের বেছে University ও DPI-তে তাদের অংশ গ্রহন করতে পাঠানো হয়। যাতে সমস্ত কলেজের সাথে আমাদের যোগাযোগ বাড়ে, জানাশোনা বাড়ে, মানুষে মানুষে বিভিন্ন সম্পর্ক তৈরি হয় এবং কলেজের সাথে সম্পর্ক গাঢ় হয়। ফলে ওই সমস্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্ববোধ। খেলার মাধ্যমে খেলোয়াড়রা কলেজের প্রতিনিধি হয়ে সমস্ত কলেজের কাছে নিজের কলেজের সমস্ত খেলাকে উপস্থাপন করে।

(৪)

* খেলাধুলো মানুষের ভেতর জাতীয়তাবোধ তৈরি করে। কারণ খেলাধুলো এমন একটি বিষয় যা একটি দেশের সকল মানুষকে এক বিন্দুতে এনে দাঁড় করাতে পারে। আমরা আমাদের নিজেদেরকেই এর উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি। খেলাধুলো যে শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে তা নয়, বরং খেলার দর্শক সমর্থকদের মধ্যেও এক ধরনের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে।

(৫)

* অতীতে মানুষ তার নিজের আনন্দ খোঁজার জন্যই খেলাধুলোর আবিষ্কার করেছে। খেলাধুলো যেমন নির্মল আনন্দ দেয় তেমনি জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। শুধু তাই নয় খেলাধুলো ব্যক্তিকে নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ এনে দেয়। মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।খেলাধুলো মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে সাবলীল ও গতিশীল করে তোলে। তাই এখন তৃতীয় জীবনে খেলাধুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

(৬)

* ছাত্র-সংসদের সমস্ত দাদাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে আমার পাশে ও সাথে থাকার জন্য। সারাটা জীবন এভাবেই তোমাদের পাশে পেতে চাই।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ

সব্যসাচী পণ্ডা

দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়া সম্পাদক

মহিষাদল রাজ কলেজ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

"আজ খাতা কলমে আমি
আমার লেখায় শুরু আমার কলেজ জীবন"

—"দুচোখ জুড়ে অনেক স্বপ্ন
স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন"—।।

আমি জানিনা সবটা বলে উঠতে পারবো নাকি, তবে প্রচেষ্টা করছি, আমার মতো সাধারন একজন ছেলে আজ 'অমিত্রাক্ষর' এর পৃষ্ঠায় স্থান পেয়ে গর্বিত। আমার কলমে প্রথম সম্মান আমার কলেজ 'মহিষাদল কলেজ' কে

"লহ হে প্রনাম তুমি বীর
তোমার জন্যেই আজ, উন্নত শীর"

২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরেই মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরনায় অনুপ্রানিত হয়ে ঠিক করলাম তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগদান করব। তারপর কলেজে স্থান, ১২ই জুলাই থেকে অতঃপর ভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগদান করা, সেইদিন থেকেই 'Union Room' সবুজ ঘরে পা দেওয়া, এই ঘরের সদস্যরা আমার পরিবার। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিল সবুজ ঘর... আর সেইদিন থেকে কাজ শুরু সবুজ ঘরের জন্য।

'শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেম'— ছাত্রসংসদের এই তিনটি মন্ত্রে আবদ্ধ হয়ে ২০১৬ — ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে, সমস্ত আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় করেছিলাম।

এইটুকু বার্তা শেখা, ছাত্রসংসদ রাজনীতি নয়। ছাত্রসংসদ হল ছাত্রদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মজবুত জায়গা, এটি একটি ভালোবাসার ছায়ায় আবদ্ধ কুটীর। এই ভালোবাসায় আবদ্ধ হতে তোমরাও এগিয়ে এসো ভালোবাসায় মোড়া সবুজ ঘরটার দিকে, বাড়িয়ে দাও খুশির হাত। আমাকে এই খুশির হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার প্রিয় রোহিত দা, নিজ হাতে কাজ শিখিয়েছে। এক, আমার সব প্রচেষ্টা সফল করতে বন্ধুসম ভাই হিসেবে পাশে পেয়েছি সবার প্রিয়, তৃণমূল ছাত্রপরিষদ তথা ছাত্র সংসদের সাধারন সম্পাদক প্রকাশ পালকে। যিনি একহাতে সংসদ সামলেছেন ও ওপরহাতে ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। আমি গর্বিত এমন একজন সাধারন সম্পাদককে পেয়ে।

আমি গর্বিত মহিষাদল রাজ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাননীয় উত্তম সমাজী-এর অধীনে থেকে কিছু করার সুযোগ পেয়ে। উনিই ভালোবেসে ২০১৮ সালে সাংস্কৃতিক বিভাগে ভারপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক সম্পাদকের স্থান দিয়েছেন, ওনার অনুপ্রেরনায় কাজ শুরু করি সাংস্কৃতিক বিভাগের। এছাড়াও এই জায়গায় আমার কলেজের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে আমার মাথায় হাত রাখেন সুরেন্দু দা ও দেবাশিষ দা। আজ ওনাদের অনুপ্রেরনায় ও সহযোগিতায় আমার প্রচেষ্টাসফলতা পায় এবং University থেকে "রঙ্গোলিতে প্রথম, বির্তকে প্রথম, Elocution-এ প্রথম, ক্যুইজে প্রথম, Photography-তে তৃতীয়, Classical Vocal-এ প্রথম, মেলাজে প্রথম এবং Classical Dance-এ দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গর্বিত হয় আমার কলেজ।

আমার লেখার এই শেষ কলমে আমি মহিষাদল রাজ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়, কলেজের অধ্যক্ষ ড: অসীম কুমার বেরা মহাশয় এবং কলেজের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা গনকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রনাম জানাই,যারা আমাকে সর্বদা সহযোগিতা করেছেন।

আমি লেখার হাতে অনেক কাঁচা, অনভিজ্ঞতার সাথে লিখেছি, সমস্ত ভুল ত্রুটি চেয়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

জয়হিন্দ
'বন্দেমাতরম্'

প্রশান্ত বেরা, দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ সেবাধর্ম

ছাত্র কল্যাণ বিভাগের সম্পাদকের বক্তব্য

যখন প্রথম কলেজ এলাম
হলাম যখন ভর্তি
সবার চোখে দেখলাম এক
আলাদা ধরনের ফুর্তি
দাদারা বলল ডেকে কীরম লাগল কলেজ?
আমি বললাম, দুচ্ছাড়ো
ভুলে গেছি সব নলেজ।
এই শুনে উত্তম দা চোখ করল বড়
আমি বললাম তুমি বাপু মোর রাস্তা থেকে সরো।
উত্তমদা বলল হেসে তোমরা মোদের গর্ব
তাইতো মোদের কলেজটা মোদের কাছে স্বর্গ।

প্রিয়, সবুজ সাথী

আমি আর পাঁচটা ছেলের মতোই একটি সাধারন ছাত্র। এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় আর উচ্চ বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়েই উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় আমার স্নেহের দাদা রোহিতদার হাত ধরে মহিষাদল রাজ কলেজে আসা। প্রথমে ভেবে ছিলাম ছাত্র সংসদের কোনো কাজে জড়িত হবো না। কোথা থেকে ওই সবুজ ঘরটির প্রতি টান বাড়তে থাকে। বিশেষত বেশি কাউকে চিনতাম না দু-এক জনকে ছাড়া। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমাদের ছাত্র সংসদটি অন্যদের থেকে আলাদা ভাবনা প্রকাশ করে। এগুলো দেখেই অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম যে অন্যদের সাহায্য করবো। দেখতে দেখতে একটি বছর হলো জানিনা কার কতটা সাহায্য করতে পেরেছি। আজ আমি ছাত্রসংসদের ছাত্র কল্যান বিভাগ-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে এই দায়িত্ব যারা আমার উপর ভরসা দিয়েছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ তারা না আমাকে সাহায্য করলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। ধন্যবাদ জানাই। উত্তমদা, সুরেন্দুদা, পাপাইদা, প্রশান্তদা, প্রকাশদা প্রমুখ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভালো সময়, খারাপ সময় আমার পাশে থাকার জন্য

প্রতি বছরের মতো এই বছরও ছাত্র সংসদের অনুপ্রেরণায় বর্ষ পত্রিকা 'অমিতাক্ষর' প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় লিখতে পেরে আমি গর্বিত, এবং আনন্দ বোধ করছি। প্রথমেই বলেছিলাম মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্রসংসদ অন্যান্যদের থেকে আলাদা ঘরানার ওভিন্ন ভাবনার মহিষাদল রাজ কলেজে নিজস্ব কেন্দ্রগত লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও সংসদ তার একটি নিজস্ব লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছে যা ছাত্রকল্যান নামে পরিচিত। এই লাইব্রেরীতে প্রায় দশ হাজার বই রয়েছে। এই নতুন বছরে নতুন সিলেবাসে নতুন বই আনতে পেরেছি যাতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিপায়। জানি না কতটা কাজ করতে পেরেছি। কতটা সাহায্য করতে পেরেছি। আগামী উত্তরসুরি হিসাবে এই বিচারেরদায়িত্ব তোমাদের। আমি শুধু এটুকুই বলব যে আমি একজন গরীব-দুঃস্থ ছাত্রের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। তাকে সাহায্য করতে পেরেছি। এটাই আমার জীবনের সার্থকতা।

পরিশেষে জানাব আমার প্রিয় স্নেহের ভাই বোন, সহপাঠি, দাদা, দিদি সবাইকে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন এবং আমার ব্যাক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রনাম।

দেবাশীষ নায়েক
সহ-সম্পাদক-ছাত্র কল্যাণ বিভাগ

মেহেবুব সোহেল বেগ
সম্পাদক-ছাত্র কল্যাণ বিভাগ।

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে

প্রিয় আমার সবুজ প্রান

"জীবনের চলার পথে পরীক্ষা প্রতিপদে
কোন পথেপা বাড়াবো,
কোন পথে মুখ ফেরাবো
তাই জানাই আমাদের জীবনের পরিচয়।"

অনেক উদ্দীপনা, অদম্য উৎসাহ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় মহিষাদল রাজ কলেজের মাটিতে পা রেখেছিলাম। আজ কলেজের ছাত্রসংসদের বর্ষপত্র অমিত্রাক্ষর লিখে আমি নিজেকে সত্যই খুব গর্বিত মনে হচ্ছে। প্রথম যখন কলেজের মধ্য প্রবেশ করি দেখি কলেজের মধ্যে সবুজ ঘর। অন্যের কাছে শুনেছিলাম। ওই সবুজ ঘরটা নাকি মায়ার বাঁধন যার নাম "ছাত্রসংসদ"। এই ছাত্রসংসদের তিনটি মূল মন্ত্র আছে। শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেম। সত্যই ওই সবুজ ঘরের দাদাদের ভালোবাসাতে Application করা ও ফর্ম ফিলাপ শিখেছিলাম। তার পরে দাদাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসাতে I-Card-এর দায়িত্ব পেয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি এত বড়ো দায়িত্ব আমি নিতে পারব। যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি দায়িত্বটা পালন করতে। ছাত্রসংসদের দায়িত্বে থাকা I-Card আমরা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর কাছে তুলে দিতে পেরেছি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যে I-Card টি দেখালে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী বাসে Concation ভাড়া দিয়ে বাসে যাতায়াত করতে পারে। এই Concation ভাড়া নিয়ে ছাত্রছাত্রীর জন্য মহিষাদল রাজ কলেজ তৃণমূলছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্রসংসদ। অনেক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলনের সুফল পাচ্ছে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী।

কলেজের মধ্যে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে কিছু ছাত্র দরদী জ্যাকেট পরা মুখোশধারী মানুষ। সেই মুখোশধারী মানুষগুলো কলেজের মধ্যে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশকে নাশ করতে চায়। সেই সকল মানুষ গুলোকে ছাত্রসংসদ নির্বাচকের দ্বারা পরাজিত করে ছুঁড়ে পেলেদিয়েছে। এই ছাত্র সংগঠন গুলি হল SFI ও ABVP এবং DSO।

প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী জানে মহিষাদল রাজ কলেজে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে পারে একটা ছাত্র সংগঠন T.M.C.P. অর্থাৎ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। যার তিনটি মন্ত্র শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পারে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর সুখ-দুঃখে পাশে থাকতে। ছাত্রের স্বার্থে লড়াই করতে। মহিষাদল রাজ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় যাদের ভালোবাসায় এই DAPT এর দায়িত্ব পেয়েছি তারা হলেন আমার স্নেহের দাদা উত্তম দা, সুরেন্দু দা, আকাশ দা, রোহিত দা, বিক্রম দা, অতনু দা, পাপই দা, দেবু দা, মনি দা, ও অন্যান্য দাদারা। আমি I-Card Dipartment-এর দায়িত্ব পেয়ে আমি কতটা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর পাশে থাকতে পেরেছি, তা তোমাদের বিবেচনার বিষয়। যাদের পরামর্শ ছাড়া আমি I-Card Dipartment-এর দায়িত্ব সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারতাম না — প্রথমে সেই ব্যক্তিটির নাম বলব সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ পাল। তার পর যাদের নাম বললে আমার অমিত্রাক্ষর লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তারা হলেন আমাকে সর্বত্র পাশে থেকে সাহায্য করেছে উত্তম দা ও প্রিয় দা, এছাড়া যারা সব সময় আমাকে সহযোগীতা করেছে রোহিত দা, সায়ন ভাই, প্রশান্ত দা, সৌরভ দা আর সব ছোটো ভাইয়েরা ও আমার স্নেহের দাদারা।

পরিশেষে বলব প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে তেরঙ্গা পতাকার তলায় এসে সকলে এক সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তিনটি মন্ত্র শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম সারা বাংলা ছাত্র সমাজ এক হও। আর তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে শক্তিশালি করতে প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয়বর্ষ, তৃতীয়বর্ষের প্রত্যেকটি সবুজ প্রাণকে ও কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সবুজ অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানাই।

কমলজিৎ দাস
সম্পাদক, পরিচয়পত্র বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে

"কষ্ট মানুষকে কাঁদায় না
নীরব করে রাখে
দুঃখ তো সুখ, যে আসে
আবার চলে যায়, দিয়ে যায়,
ভুলতে না পারা কিছু দিন, কিছু সময়
তত কিছু স্মৃতি...

জীবনপঞ্জির স্বর্ণ মুহূর্তে লেখনি পত্রে কিছু রঙ বেরঙের কালি নিয়ে একটু হাতে দক্ষ লেখকের মতো লেখার চেষ্টা করেছি কিন্তু লিখতে পারিনি, শিখতে পারিনি কবির ভাষা।

শুধু তাদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা যাদের সহযোগিতায় আমি আমার স্বর্ণময় বছর অতিবাহিত করতে পেরেছি। ছন্দছাড়া অর্থহীন ভাষাকে জড়ো করে প্রথমে সকল এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

প্রথমে বলি আমি কোনো কবিতা লিখতে ও গল্প লিখতে পারি না ও জানিও না। তাই কী লিখবো ভেবে উঠতে পারছিনা। তবুও লিখতে হবে। আমাদের কলেজে ছাত্র-সংসদ প্রতিবছর একটি বর্ষপত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হয় এবং আমি সত্যিই খুবই ভাগ্যবান যে পর পর দুবছর এই বর্ষ পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছি। শুরু করবো কীভাবে কলমের কালি দিয়ে লেখা তা খুঁজে পাচ্ছিনা। তাই ভাবলাম স্কুল জীবনের কথা দিয়ে শুরু করি। ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মহিষাদল রাজ কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়ার পর এক মাস পর সাধারণ বিভাগে ভর্তি হই। তারিখ টা ছিল ১৯শে জুলাই। এবার একটু নিজের সম্পর্কে আগে বলে নেই। নিত্যজীবন আমি কিন্তু বাউন্ডেলে ছেলে ছিলাম। বন্ধুদের সাথে আড্ডা তারপর কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যে একজন দাদার সঙ্গে দেখা করে ভর্তি হই, সেই দাদা হল উত্তমা। তারপর আসতে আসতে কলেজ আসা শুরু করলাম। শুনলাম সবুজ ঘরে নাকি মায়া আছে, ওই সবুজ ঘরের দাদা দের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রতিদিন সবুজ ঘরে আসতে শুরু করলাম। আসতে আসতে কয়েকদিনের মধ্যে সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে গেলাম। তারপর ছাত্র সংসদের ১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলাম ২১ জানুয়ারী ছাত্র সংসদের সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ভার পেলাম। তারপরেই সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করলাম দ্বিতীয় বর্ষে ভোট না হওয়ার জন্য নিজের ওপর দাদারা ছাত্র সংসদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের পদ আমার হাতে সমর্পন করে। তারপর নিজের উপর সবকিছুটা মাথায় রেখে ৩৬৪ দিন ছাত্র-ছাত্রীদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণ করে শুধুমাত্র ছাত্র সংসদের কর্মের সারথী হয়েছি। চেষ্টা করেছি আমার শ্রম, নিষ্ঠা, সাধনা ও আবেগ দিয়ে পুরানো ঐতিহ্য পরম্পরা বজায় রেখে নতুন প্রজন্ম তৈরি করার শেষ গাড়ির ছাত্র হিসেবে ছাত্র সংসদের দাড়িপাল্লায় পদার্পন করে তোমাদের হাতে হয়তো বেশি কিছু তুলে দিতে পারিনি।

* ছাত্র সংসদে একটা নতুন কম্পিউটার ও কালার প্রিন্টার এনে দিতে পেরেছি।

* প্রতি বছরের মতো এবছর ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রতিনি অনার্স ও পাশ কোর্সে গত বছরের তুলনায় এবছর বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে পেরেছি।

* ছাত্র সংসদ বর্তমান বর্ষে আমাদের জেলাস্তরে ছাত্র যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ধন্যবাদ জানাই এর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শুভময় দাস মহাশয়কে। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা গুলি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং অভিনন্দন জনাই। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা বিভাগীয় সম্পাদক, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের। মহা সাড়ম্বরে ২০১৮ পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়েছে যা ছাত্র সংসদ দ্বারা পরিচালিত এবং ২০১৯ শে গোয়া যাওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

"ওগো আজি এ প্রভাতে
চোখ মেলে দেখ
শুরু হল নতুন বছর"

নতুন বছর হল ২০১৯। শুরু হল কিছু স্বপ্ন পূরণের আশা। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল ২০১৭ সালে ২১শে জানুয়ারী। Students' Union কথাটা মানে সবাই রাজনীতিকে ভেবে থাকা আমিও সবার মতোই তো ভেবেছিলাম আমি তোমাদের থেকে আলাদা নয় কিন্তু আমার ভাবনার অবশান ঘটিয়ে দিয়েছে এক ব্যক্তি যিনি আমার অন্ধকার জীবনে এক আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো এসে আমায় আলোকিত করে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য দায়ী নন তিনি আমায় জীবনের সঙ্গাকে পালটিয়ে দিয়েছেন বুঝিয়েছেন Union কোনো রাজনীতির সংখ্যার নয় বা রাজনীতির আঁতুড় ঘর নয়। Union হল সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকা ও তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা। যদি তিনি আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো আমার জীবনে না আসতেন তাহলে আমার জীবনে অন্ধকারের অবশান হয়তো কখনো হত না।

উত্তমের মতো এসেছে
ভরিয়ে দিয়েছে আমার জীবন
হে মোর উত্তম দাদা

এবং ছাত্রজীবনে এবং আমার চলার জীবনে চলার সাথী ও পথের সাথী হয়তো সে নায়ো থাকলে আমার বন্ধুত্ব জীবন অটুট হত না। যাকে ভাই বলে ডেকে থাকি বন্ধু বলে মনে করি না সে হল মিঠি প্রশান্ত। এবং আরও একজন যার কথা না বললে নয় আমার পাশে সবসময় থেকেছে ও নানান কাজে আমায় উপদেশ দিয়েছেন কীভাবে কাজটা সম্পূর্ণ করাযায় এবং কিছু ভুল ত্রুটিতে নিজের দাদার মতো শাসন করেছে হল রোহিতদা। আমার সংসার অর্থাৎ ছাত্রসংসদের মুখ্যপাত্র আমি ও আমার সংসারে অভিভাবক যারা যাদের কথা না বললো হয়তো আমার লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে সে মাননীয় তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়, সন্দীপ মিশ্র, সুরেন্দু দা, রাম দা, মঙ্গল দা, দেবাশীষ দা, গৌতম দা, বিক্রম দা ও বর্তমানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি উত্তম সমাজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এবং ছাত্র সংসদের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ যারা আমার পাশে থেকেছে অতনু দা, আকাশদা, প্রিয়দা, সুমন দা, দেব দা, মনি দা, সৌমেন দা, অভি দা, সুরজিৎ দা, পাপাই দা, মন্তেশ্বর দা, নিলু দা, সুকীর্তি দা এবং কলেজে ক্যান্টিন এ থাকা সেই দাদা হল গৌতম দা ও আমার সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আমার ভালোবাসা জানাই।

আমরা শিক্ষার প্রগতির কথা বলি তাই মহিষাদল রাজ কলেজ শিক্ষা সংস্কৃতির প্রথম স্থানে আছে। আমরা সংঘবদ্ধজীবনের কথা বলি তাই এই সবুজ ঘরের ৪৬ বছর ধরে এক সাথে আছি আমরা দেশপ্রেমের কথা বলি দেশপ্রেম জাতীয় পতাকার তোলায় দাড়িয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করি। আশা করি তোমারও এই ধ্বনি উচ্চারণ করে নিজেদের সবুজ রঙে রাঙিয়ে নেবে।

সোনার সংসার আমায় যা দিয়েছে তার তুলনায় আমি তা কিছু হয়তো দিতে পারিনি, চেষ্টা করবো এই সোনার সংসারকে ভালোবাসায় ফুলে ভরিয়ে দিতে। শেষ বেলায় আমার কিছু কথা আর বলার নেই, নেই আর মনের ভেতরে গভীরে থাকা কোনো কথা। যতই দুঃখ কষ্ট যাই থাকুক না কেনো আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে সবাইকে ভালোবাসা দিয়ে যাব। নতুন কোনো আশা, নতুন কোনো স্বপ্ন প্রভাতের সূর্যদ্বয়ের মতো যেমন ওঠে এবং শেষে সূর্যাস্তের মতো পূররের শেষ আসা। যদিও নতুন বছরের সূর্যদ্বয় আমার জীবনে কোনো স্বপ্ন নিয়ে আসছে আমি সেই প্রতিক্ষায় রইলাম।

পরিশেষে সকল তথা মহিষাদল রাজ কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ, শিক্ষাকর্মী এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল ও শুভকামনা করে শেষ করছি।

জাতীয়তাবাদি গৈরিক অভিনন্দনসহ—

প্রকাশ পাল
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রসংসদ

এমি নোয়েথার : এক অনন্য জীবন

নবব্রত ঘোষাল
অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

একটা সময় ছিল যখন ইউরোপের অন্যান্য আরও কয়েকটা দেশের মতো খোদ জার্মানিতেও মনে করা হত বুদ্ধি-বৃত্তি ও মেধায় পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেকটাই খাটো। সেইসময় মেয়েদের সেভাবেই গড়ে তোলা হত যাতে বড় হয়ে তারা 'ভাল-স্ত্রী' এবং তারপর 'আদর্শ-মা' হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের স্কুল সিলেবাসে জার্মান, ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষা শেখানোর পাশাপাশি সূচি ও রন্ধন-শিল্প, পিয়ানো-বাজানো ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেটা ছিল আঠারো শতকের জার্মানি। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার আঙিনায় শুধুমাত্র পুরুষদের বিচরণ তখন। ইউনিভার্সিটি চত্বর একপ্রকার নারী-বিবর্জিত।

ঠিক এইরকম একসময় জার্মানির এরল্যাংগেন ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর ম্যাক্স নোয়েথার তাঁর কিশোরী কন্যা এমি-কে নিয়ে পড়লেন মহা সমস্যায়। সেলাই অথবা পিয়ানো-শেখা এমির এতটুকুও ভাল লাগেনা। এমির সমস্ত মন পড়ে থাকে অঙ্কের দিকে। আর হবে নাই-বা কেন? গণিতশাস্ত্রের বিদুষী কন্যাদের কত গল্পই-না শুনেছে এমি তার বাবার কাছে সেই কোন ছোট্ট বয়স থেকে। আলেকজান্দ্রিয়ার হিপাসিয়া-র গল্প শুনতে তার ভারী ভাল লাগে। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার এই ভুবনখ্যাত মহীয়সীকে ধরা হয় পৃথিবীর প্রথম মহিলা গণিতবিশারদ। তাঁর পান্ডিত্যের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সেসব শুনতে চায় এমি। আবার কখনওবা সমকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সোফিয়া কোভালেভস্কির গণিত প্রতিভার কথা বলেন প্রফেসর। এমির কাছে অঙ্ক হয়ে ওঠে যেন এক রূপকথার জগৎ! এদিকে আবার অঙ্কের ধাঁধা চটপট সমাধান করে ফেলতে পারে এমি। বাবা-মা অবাক হয়ে দেখেন মেয়ের আশ্চর্য প্রতিভা। একইসঙ্গে তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে ওঠে। জার্মানির কোনও ইউনিভার্সিটিতেই মেয়েদের প্রথাগতভাবে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। প্রফেসর ম্যাক্স-এর জেদ চেপে গেল। মেয়ের অঙ্কের প্রতিভাকে তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। নাই-বা পাওয়া গেল ডিগ্রী অথবা কোনো ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট - গণিতচর্চায় আপত্তি কোথায়! এমির জন্য দুজন টিউটর রাখা হল। বাড়িতে এসে অঙ্ক এবং অন্যান্য বিষয় শেখাতে শুরু করলেন তাঁরা।

১৯০০ সাল। এমির ঠিক আঠারো বছর বয়স। এখন থেকে এমিকে প্রফেসর ম্যাক্স তাঁর নিজের ক্লাসে এনে বসান। ম্যাক্স-এর অনুরোধে এরল্যাংগেন ইউনিভার্সিটিতে আরও কয়েকজন প্রফেসরের ক্লাসে থাকার অনুমতি জুটে গেল এমির। এমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অ্যালজেব্রা, ক্যালকুলাস শিখতে থাকেন।

ইতিমধ্যে এমি বারো ক্লাসের পরীক্ষা 'আবিতুর' পাশ করলেন প্রথমবারের চেষ্টাতেই। অবশ্য এর জন্য তাঁকে দূরের অন্য এক শহরের স্কুল (জার্মানিতে একে 'জিম্‌ন্যাসিয়াম' বলে)-এর অধীনে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। যাইহোক, 'আবিতুর' হল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ছাড়পত্র। কিন্তু মুশকিল হল এই ছাড়পত্র কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রফেসর ম্যাক্স খুব ভাল করেই জানেন সেকথা। তবুও এমির পরের

ধাপের পড়াশোনার জন্য বেছে নিলেন গাটেনগেন ইউনিভার্সিটিকেই। জার্মানির এই গাটেনগেন ইউনিভার্সিটি সেসময় গণিতের পীঠস্থান। পৃথিবীর তাবড় তাবড় গণিতবিশারদরা রয়েছেন সেখানে। ঋষিতুল্য গণিতবিজ্ঞানী ডেভিড হিলবার্ট রয়েছেন। গবেষণা ও পড়ানোয় নিমগ্ন। ইতিমধ্যে জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর অঙ্কের বই 'ফাউন্ডেশনস্ অফ জিওমেট্রি' ফরাসি ও ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে বিশ্বের একাধিক উচ্চতর-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা লাভ করেছে। ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রির অ্যাক্সিওমেট্রিক অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ, স্বতঃসিদ্ধ প্রথায় ভিত্তি করেই হিলবার্ট সৃষ্টি করেছেন তাঁর এই বইখানা। ইউক্লিডের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে নতুন তত্ত্ব প্রদান করেছেন হিলবার্ট। গাটেনগেন-এ রয়েছেন তাঁর সঙ্গী আর এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ফেলিক্স ক্লীন। একইসঙ্গে হারম্যান মিন্‌কস্কি, কার্ল সোয়ার্জচাইল্ড এবং আরও সব বিজ্ঞানীরাও আছেন সেখানে।

এমি নোয়েথার হাজির হলেন গাটেনগেন ইউনিভার্সিটিতে। ১৯০৩ সাল নাগাদ। কেবলমাত্র 'অডিট-ক্লাস'-এর জন্য এমির নাম রেজিস্টার খাতায় নথিভুক্ত করা হল। 'অডিট-ক্লাস' বলতে সেই ক্লাসকেই বোঝায় যেখান থেকে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন হয়, কিন্তু কোনোরকম ডিগ্রী অথবা গ্রেড লাভ হয়না। হিলবার্টের ক্লাস থেকে এমি অঙ্কের নতুন এক ধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। অল্পদিন পরেই যা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট-অ্যালজেব্রা' হিসেবে পরিণতি পাবে তাঁর হাত ধরেই। আর 'নোয়েথারস থিয়োরেম', 'নোয়েথারিয়ন রিং' -এই নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তত্ত্বের আবিষ্কার ঘটবে।

ছোটবেলা থেকেই এমি কখনওই লাজুক ছিলেন না। উল্টে ভারী মিশুকে স্বভাবের। আর কথা বলেন যেমন উচ্চস্বরে, তেমনই প্রাণখুলে হাসেন। বরাবরই খানিক মোটাসোটা চেহারা এমির। অল্পদিনেই প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বড় কারণটা হল, ক্লাসে এমি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেন টিচারদের। মস্ত বড় সব পণ্ডিত প্রফেসর। এমির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর বোধ তাঁদের নজর এড়ায় না।

গাটেনগেন-এ এক সেমিস্টার কাটানোর পর এমি তাঁদের এরল্যাংগেন-এর বাড়িতে ফিরে এলেন। গাটেনগেন-এ শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না তাঁর। বাড়ির অন্তরে নিভৃতে গণিতচর্চা চলতে থাকল এমির। ঠিক এইসময় এরল্যাংগেন ইউনিভার্সিটি ঘোষণা করল রেগুলার স্টুডেন্ট হিসাবে 'ম্যাট্রিকুলেশন' দিতে পারবে মহিলারাও। বোঝাই যায়, জার্মানির সমাজজীবনে নারীদের অবস্থান ক্রমে পাল্টাচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী লাভের এমন সুযোগ এমি হাতছাড়া করলেন না। প্রফেসর ম্যাক্স-এর অনুরোধে বিখ্যাত গণিতবিজ্ঞানী পল গর্ডন রাজি হলেন এমি-কে গাইড করার। গর্ডনের তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করলেন এমি নোয়েথার। এরল্যাংগেন ইউনিভার্সিটিতে এর আগে কোনও মহিলা এই সম্মান পাননি। এমি নোয়েথার হলেন প্রথম জার্মান মহিলা যিনি ডক্টরেট হলেন। এরপর একটানা আট বছর এই এরল্যাংগেন ইউনিভার্সিটিতেই গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন ডক্টর এমি নোয়েথার। কিন্তু নিয়ম না থাকায় ইউনিভার্সিটি দেয়নি তাঁকে কোনপ্রকার সাম্মানিক। না কোনও একাডেমিক স্বীকৃতি।

এদিকে প্রফেসর গর্ডন-এর অঙ্কের পদ্ধতি এমির আর পছন্দ হচ্ছিল না। গর্ডন জটিল থেকে জটিলতর ক্যালকুলেশনের সিঁড়ি বেয়ে অভীষ্টে পৌঁছতে চান। গণিতের সাংকেতিক চিহ্নই তাঁর একমাত্র ভাষা। অপরদিকে এমির পছন্দ অঙ্কের বিমূর্ত রূপ বা অ্যাবস্ট্রাক্টনেস। এরল্যাংগেন-এ পিএইচডি-পরবর্তী অধ্যায়ের গবেষণার বেশিরভাগটা জুড়েই ছিল গণিতের একেবারে নতুন বিষয় অ্যাবস্ট্রাক্ট-অ্যালজেব্রা।

যার ইংগিত পেয়েছিলেন গাটেনগেন-এ থাকার সময় হিলবার্টের ক্লাসে। গণিতের এই নতুন ধারাকে ডক্টর এমি নোয়েথার এতদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যা অন্যদের কাছে যোগগম্য হওয়াই দুষ্কর ছিল। ১৯১৪-য় তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

এর ঠিক পরের বছর ডক্টর এমি নোয়েথারকে গাটেনগেন-এ আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন প্রফেসর হিলবার্ট এবং প্রফেসর ক্লীন। এই সময় আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' তাত্ত্বিক গবেষকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল। প্রফেসর হিলবার্ট এবং প্রফেসর ক্লীন এই থিয়োরির একটা ম্যাথেমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। পদার্থের উপস্থিতিতে স্পেস-টাইম-এ যে বক্রতার সৃষ্টি হয় তারই ফলশ্রুতি হল মহাকর্ষ। কিন্তু এই তত্ত্বের গাণিতিক প্রমাণ চাই। একপ্রকার নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাঁরা অঙ্ক কষে চলেছেন। অপরদিকে আইনস্টাইনও সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা। হিলবার্ট এবং ক্লীন অনেকদূর এগিয়েও আটকে গেছেন। একটা ধাঁধার সামনে থমকে গেছে তাঁদের ক্যালকুলেশন। জট ছাড়াতে পারছেন না কিছুতেই।

সংশ্লিষ্ট গণিতে অত্যন্ত দক্ষ এমি নোয়েথার। তাই তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এমি নোয়েথার আশা করেছিলেন গাটেনগেন-এ নিশ্চয়ই তিনি গবেষক অথবা অধ্যাপকের সরকার স্বীকৃত একটা পদ পাবেন। কিন্তু তা হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে এই ধরণের অফিশিয়াল পদ পাওয়ার জন্য দরকার ছিল আর্টস এবং সায়েন্স সমস্ত ফ্যাকাল্টির সমর্থন। একজন মহিলাকে এই পদে নিয়োগ করতে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রবল আপত্তি ছিল। প্রফেসর হিলবার্ট মন্তব্য করেছিলেন – 'ভদ্রমহোদয়, ডক্টর নোয়েথারকে যেখানে নিয়োগ করার কথা ভাবা হচ্ছে তা কিন্তু একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কোনও স্নানাগার নয়। তাই এক্ষেত্রে পুরুষ-কি-নারী সে বিচারের তো প্রয়োজন নেই।' শেষমেশ এটাই ঠিক হল যে প্রফেসর হিলবার্ট-এর সাহায্যকারী হিসেবে ডক্টর এমি নোয়েথার ক্লাস নেবেন। পাশাপাশি গবেষণা করতে পারবেন। কিন্তু এসবের জন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক পাবেন না। ডক্টর এমি নোয়েথার অতি সাধারনভাবে থাকতেন। পারিবারিক সূত্রে যেটুকু আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়েই নিজের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিলেন।

নোয়েথার তাঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট-অ্যালজেব্রার সাহায্যে হিলবার্ট এবং ক্লীনের থিয়োরিতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন। তাঁর এই আবিষ্কার জন্ম দিল নোয়েথারের দ্বিতীয় থিয়োরেম। একইসঙ্গে পাওয়া গেল নোয়েথারের প্রথম থিয়োরেম। এই থিয়োরেম অনুযায়ী – 'যেকোন প্রতিসাম্য থাকলেই তার প্রতিষঙ্গী একটা সংরক্ষণ সূত্র থাকবে।' পার্টিক্যল-ফিজিক্সে এই থিয়োরেম অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আইনস্টাইন নোয়েথারের এই থিয়োরেম সম্পর্কে বলেছিলেন, 'নোয়েথারের এই থিয়োরেম-এর মত অঙ্কের আর কোনও থিয়োরেম পদার্থবিজ্ঞানে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।'

১৯১৯ সালে ডক্টর এমি নোয়েথার সরকারি স্বীকৃতি পেলেন গাটেনগেন-এ পড়ানোর। যদিও রিসার্চ-গাইড হতে পারবেন না তিনি। ১৯৩২ পর্যন্ত গবেষণা ও পড়ানোর কাজে নিমগ্ন ছিলেন নোয়েথার। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নোয়েথারের ছাত্রদের বলা হত – 'নোয়েথার বয়েজ'। আজীবন অবিবাহিত নোয়েথার ছিলেন তাদের মায়ের মত।

১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এলেন আডল্‌ফ হিটলার। জার্মানির চ্যান্সেলর। আঠারো জন বিজ্ঞানীকে গাটেনগেন-এর ম্যাথেমেটিক্যাল ইন্সটিটিউড থেকে তাড়ানো হল। ডক্টর এমি নোয়েথারও রয়েছেন সেই তালিকায়। এই সব বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নাৎসি বাহিনীর এই লিডার নিশ্চিত হয়েছিলেন এঁদের সকলেরই দেহে

নাকি ইহুদী রক্ত বইছে। তাই এমন সিদ্ধান্ত। বিতাড়িত বিজ্ঞানীদের বেশীরভাগই জার্মানি ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। সেখানকার কোন কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিলেন।

এদিকে প্রফেসর হিলবার্ট গাটেনগেন থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। সত্তর বছর বয়স তাঁর। তাঁকে নিয়ে নতুন সরকার গর্বিত। তিনি নর্ডিক। বিশুদ্ধ আর্য। কিন্তু হিলবার্ট মর্মাহত। নাৎসি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী উইলহেম রাস্ট একদিন প্রফেসর হিলবার্টকে বলেছিলেন, 'গাটেনগেন ইউনিভার্সিটির গণিতচর্চার অগ্রগতি কেমন এখন? সমস্ত ইহুদিদের তো সেখান থেকে বের করে দিয়েছি! ভাল নিশ্চয়ই?'

উত্তরে প্রফেসর হিলবার্ট বলেছিলেন, 'গাটেনগেন এখন মৃত। সে প্রতিষ্ঠানে আর কেউ আছে নাকি!'

নতুন সরকারের টেলিগ্রামখানা হাতে পেয়ে নোয়েথার প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু না। বুঝলেন তাঁকে গাটেনগেন ছাড়তেই হবে।

শেষমেশ ১৯৩৩এর অক্টোবর মাসে বাক্স-প্যাটরা বেঁধে জাহাজে চড়ে বসলেন। নিউইয়র্ক-এর উদ্দেশ্যে।

আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার ব্রাইন-ম্যর উইমেন্স্ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। সেখানে বছর দুয়েক পড়ানোর সুযোগ হয় তাঁর। চিকিৎসার ত্রুটির কারনে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মারা যান গণিতের এই প্রতিভা, 'মাদার অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট-অ্যালজেব্রা' - ডক্টর এমি নোয়েথার।

বর্তমান প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের অভিমত - ডক্টর এমি নোয়েথার সমাজটাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেখিয়েছিলেন - নারীরা অঙ্কে পারদর্শী হতে পারে। তাঁর গবেষণা ছিল সমাজের জন্য 'ওয়েক-আপ-কল'।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

সমির কুমার পাত্র
বিভাগীয় প্রধান (ইতিহাস)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধাননেতাদের সুভাষচন্দ্র কোন চোখে দেখেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে। তাঁর অসমাপ্ত আত্মকথা 'An Indian Pilgrim' তিনি লিখেছেন অরবিন্দের কথা। সেখানে লিখেছেন 'অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ'। অরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে রাজনীতিতে ফিরে আসবেন এরকম বিশ্বাস করতেন সুভাষচন্দ্র।

এক সময় বাংলার নায়ক ও জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ সুভাষের চোখে অরবিন্দ থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক ধরনের ছিলেন। দাদা শরৎচন্দ্রকে কেমব্রিজ থেকে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন '...সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনের শেষ প্রান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরে মন্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হয়েছেন তার কারণ তিনি এডমন্ড বার্কের সুবিধাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। তবে তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মূল্যায়ন স্বভাবতই সশ্রদ্ধ। তাঁকে সুভাষচন্দ্র অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও নির্ভিক বলেছেন।

গান্ধী সম্পর্কে সুভাষের মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত সাহসিক। তিনি লিখেছেন মহাত্মা গান্ধীর এমন কিছু আছে যা তার দেশ ও কালের মানুষকে অভিভূত করে। তাঁর মতে রাশিয়া - জার্মানী বা ইতালীতে জন্মালে অহিংসা মতবাদের জন্য গান্ধীর প্রাণদণ্ড হত। কিন্তু ভারতের দরিদ্র মানুষের কাছে তাঁর সস্ত সুলভ সরল জীবন ও তাঁর নানা ধর্মীয় অনুসঙ্গই তাঁকে মহান করে তুলেছে। তবে তিনি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ একথাও সুভাষচন্দ্র বলেছেন। তাঁর 'মুক্তিসংগ্রাম' গ্রন্থে।

গান্ধীর সমসাময়িক যে সব প্রধান নেতাদের কাজকর্ম সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই তিনি মূল্যায়ন করেছেন 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থটিতে। তিলককে তিনি গান্ধীর একমাত্র প্রতিবাদী বলেছেন। তাঁর চোখে তিলক ছিলেন এক বিরাট পাণ্ডিত্য সম্পন্ন পুরুষ, তাঁর সাহস ও ত্যাগ ছিল অপরিসীম।

তিলকের পর যারা বিশিষ্ট নেতা ছিলেন ও ১৯২১ সালে যাদের সমর্থন না পেলে গান্ধী সাফল্য লাভ করতেন না সুভাষচন্দ্রের মতে তাঁরা হলেন — দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত ও মৌলনা মহম্মদ আলী। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন নিজ নিজ দেশে প্রভাবশালী ও 'কংগ্রেসের বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন নায়ক'। লালা লাজপত-কে তিনি 'পাঞ্জাবের মুকুটহীন সম্রাট বলেছেন। আবার পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু ছিল সুভাষের কাছে বিপর্যয় স্বরূপ। সুভাষ লিখেছেন এই মৃত্যুর ফলে 'কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেষ পুরুষটি অন্তর্হিত হলেন। প্রধান নেতাদের মধ্যে আরেকজন

বল্লভভাই প্যাটেল সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সশ্রদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন বলে।

সর্দার বল্লভাই প্যাটেল, ডঃ আনসারি, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ মহম্মদ আলম, জওহরলাল নেহেরু, রাজা গোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখকে সুভাষচন্দ্র 'কংগ্রেসের মধ্যে যারা মহাত্মার বিশ্বস্ত সমর্থক' বলেছেন। আর এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরুর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। তবে তাঁর চোখে নেহেরুর মধ্যে নেহেরুর যে অতিপ্রয়োজনীয় গুনটির অভাব ধরা পড়েছে তা হলো জনমতের বিরোধিতা করে প্রয়োজনে অপ্রিয় হওয়ার সাহসের অভাব। নেহেরুকে সম্পূর্ণ বামপন্থী বলতেও সুভাষ দ্বিধান্বিত। নেহেরু সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেন অথচ কার্যক্ষেত্রে তিনি মহাত্মার একজন অনুগত শিষ্য। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন বুদ্ধির দিক দিয়ে নেহেরু বামপন্থী কিন্তু হৃদয়টা তাঁর পড়েছিল মহাত্মা গান্ধীর কাছে। অন্যান্য গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যে মৌলনা আজাদকে সুভাষচন্দ্র আখ্যায়িত করেছেন 'বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অন্যতম' বলে।। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনোনয়নের পর সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিচয় দেন এই ভাবে 'মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়াভক্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, যিনি একান্তভাবেই গান্ধীজির চিন্তাধারা অনুসারে চলবেন আশা করা হতো'। আর সর্দার প্যাটেল ছিলেন সুভাষের দৃষ্টিতে মহাত্মার বিশ্বস্ততর ভক্ত।

মানুষ ও শিক্ষক লালজি সিং
ভারতীয় ডি এন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর জনক

অধ্যাপক শুভময় দাস
মহিষাদল রাজ কলেজ

বিদ্যাজন আর শিক্ষালাভের মধ্যে পার্থক্য আছে বিস্তর। বিদ্যার্জন মানে যদি হয় ভাষা গণিত বিজ্ঞছান ইত্যাদির তথ্য প্রয়োগ শিখে নেওয়া তাহলে শিক্ষালাভ হল জীবনে কীভাবে চলতে হবে তা আয়ত্ত করা। স্কুলের কলেজের শেখা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি সমস্ত ভুলে যাওয়ার পর যা বাকি থাকে তা ই হল শিক্ষা। তিনিই হলেন শিক্ষক যিনি বিষয় ভুলে যাওয়ার পরও যিনি মনের মধ্যে থাকেন। জীবন কীভাবে চলবে তার দিক দর্শন করেন। ঠিক করে দেন কীভাবে বাঁচতে হবে।

লালজিৎ সিং। শিক্ষক, বিজ্ঞানী। ভারতবর্ষের ডি এন এ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর জনক। জনক তো তিনি যিনি কেমন তার আবিষ্কারক নন- অনেক সন্তান-শিষ্য তৈরি করবেন যাঁরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে পৃথিবীকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ইনি এমন একজন শিক্ষক যিনি মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন তাঁর নিজের জীবন্ত শিশুকে। হাসপাতালের বেডে বদলে যাওয়া পাল্টে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে দেন আর শিশু পাচারচক্রের সমাধান করতে পারেন এই শিক্ষক।

তিনি এমন এক শিক্ষক যিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন কোন সন্তানকে তাঁর হারিয়ে পিতৃমাতৃ পরিচয়। এই বিজজ্ঞানী পারেন রহস্য সমাধান করতে - খুনি ধরতে - আততায়ী - ধর্ষণ কেসের আসামিকে ধরতে। ইনিই পারেন জঙ্গলে খুন হয়ে যাওয়া বাঘ কিংবা হাতির শিকারীকে ধরতে পাচার হওয়া হাতির দাঁতকে বাজেয়াপ্ত করে খুনের কিনারা করতে। কে কবে কোথায় খুন করল অনায়াসেই ধরতে পারেন তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে। জিন টেকনোলজি প্রয়োগ করে ভেজাল বাসমতি চালের রপ্তানী আটকাতে ইতি পারেন। সাপের ক্রোমোজোম কীভাব সাপকে ছেলে অথবা মেয়ের রূপান্তরিত করে এই জটিল রহস্যের সমাধান করতে পেরেছেন এই সাহসী ভারত সন্তান। এই শিক্ষকের নাম লালজি সিং।

উনিশশো সাতচল্লিশ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবে আসবে করছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আসার ঠিক এক মাস আট দিন আগে অর্থাৎ নয় জুলাই উনিশশো সাতচল্লিশ সাল। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের কালজানি- এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক লালজির। বাবা সূর্যনারায়ণ সিং। চাষিবাসী মানুষ। গ্রামের মোড়লও বটে। পড়া শুরু করলেন গ্রামের স্কুলে। ক্লাস এইট পর্যন্ত। এর পর প্রায় আট কিলোমিটার দূরের প্রতাপগঞ্জ স্কুলে ইলেভেন অব্দি বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেন। এর পর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে প্রাণীবিদ্যা নিয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। এম এসসি পাশ করলেন অসাধারণ রেজাল্ট নিয়ে। স্বর্ণপদক লাভ করলেন। ১৯৭১ এ বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটি থেকে পিএইচডি। গাইড বাঙালি বৈজ্ঞানিক এসপি রায় চৌধুরী। গবেষণার বিষয় ভারী মজার বারতীয় সাপের - ক্রোমোজোম এবং তার বিবর্তন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় এই রকম বিদঘুটে বিষয় নিলেন কেন ? তাঁর গাইডের উত্তর ছিল আরে- যে বিষয়টা অন্য কেউ ছুঁয়ে দেখে না ওইটাই বিষয় হওয়া উচিত। লালজী সিংহ লেগে পড়লেন সাপ নিয়ে গবেষণায়। রিসার্চের ফলাফল বের হলো। ক্রমোজমিয়া নামক জার্নালে প্রকাশ পেল।

উনিশশো চুয়াত্তর সালের ইনশা ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড ৭১-৭২এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। অর্থাৎ লালসিং আমাদের কলকাতার মানুষ। আমাদের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-গবেষক-শিক্ষক। কলকাতায় ১৯৭৪-এ সিএসআইআর এর পুল অফিসার কমনওয়েলথ ফেলোশিপ। ৮৭তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গেস্ট সায়েন্টিস্ট। অস্ট্রেলিয়ায় ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করে ৮৭তে ফিরলেন ভারতবর্ষে। অধীত বিদ্যা অর্জিত জ্ঞান ভারতমাতার কাজে লাগাতে চাইলেন। সিসিএমবি হায়দ্রাবাদে সিনিয়র গবেষক হিসেবে শুরু করলেন। ইনশ ১৮৯৮ এ হায়দ্রাবাদ সিসিএমবির চতুর্থ ডাইরেক্টর হলেন। ২০০৯ পর্যন্ত থাকলে। ২০০০ এ জগদীশচন্দ্র বসু ন্যাশনাল ফেলোশিপ। ২০১০ এ ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শিরোপা শান্তিস্বরূপ ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড। ২০১১ তে উপাচার্য হলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তাঁর বেড়ে ওঠা। অবাক লাগে এই তিন বছরে বেতন নিয়েছেন এক টাকা। এ মানুষ ভারতবর্ষে জিনোম ফাউন্ডেশন গড়লেন-ডাইরেক্টর হলেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের গবেষণা জীবনে দুশো তিরিশটির বেশি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

কে ছিলেন এই লালজি সিং? কেমন মানুষ - কেমন বৈজ্ঞানিক ছিলেন? ভালোবাসতেন দেশমানুষ। সিং স্বল্পভাষী হাস্যপ্রিয় - মাথা গরম মাটির শিঁকড়ে ভালোবাসা - হৃদবান গরীবের কান্না বুঝতে পারা - জীবন ভালোবাসা এক সম্পূর্ণ মানুষের নাম লালসিং। তিনটি সখ ছিল- তাঁর মন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্ন দেখো - সাহসী হও - শপথ নাও। সোজা সাপটা ভাষায় কথা বলতেন। পয়েন্টে পয়েন্টে পা দিয়ে বিজ্ঞানের সুতোর উপর এগিয়ে এগিয়ে সম্ভাবনার তিনি সেতু বানাতেন। বলতেন - ''একশো ভাগ সমর্পণ না করে, কোনো বিজ্ঞানের কাজে হাত দেবেন না'' এটাই ছিল তার জীবন দর্শন। তিনি ভারতে কিশোর বিজ্ঞান পড়ুয়াদের কাছে এক সংক্রামক জীবাণু ছিলেন। ভারতীয় কিশোর বৈজ্ঞানিকদের তিনি সংক্রামিত করছেন বিজ্ঞানকে - প্রকৃতিকে - ভালোবাসাকে। বিজ্ঞান - প্রকৃতি - মানবতার আর আত্মপ্রত্যয়ের শিঁকড় ক'জনই বা পেরেছেন এই ছাত্রদের মধ্যে কথিত করতে। যিনি জীবনের সংক্রামক হয়ে উঠতে পারলেন না তিনি আবার শিক্ষক কিসের। এ প্রসঙ্গে সিং আদর্শ পথ প্রদর্শক।

বিজ্ঞান তো কোনো নীল আকাশ নয়। বিজ্ঞান হল মাটির কাছাকাছি আর মাটিতে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান। ল্যাব টু ফিল্ড। যে জ্ঞান প্রয়োগ মূল্য নয় সেতো প্রজ্ঞা নয়। এখানেই লালজির সার্থকতা। প্রতিটি জ্ঞানকে প্রয়োগ করে আম আদমীর সংকট মোচন হল তার ধর্ম - তার জাত - তার ব্রত - তার প্রতিজ্ঞা। তার কাজ দেখে লোকে হেসেছে - উপহাস করেছে- অতীতে যেমন করেছে গ্যালিলিও কেউবা ডারউইনকে। তাঁর ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। তাসত্ত্বেও তিনি দমেননি। তাঁর আবিষ্কার করা পদ্ধতিতে হারানো শিশু ফিরে আসে- পরিচয়হীন সন্তান ফিরে পায় পিতামাতার পরিচয় - বাসমতী চাল ফিরে পায় তার বিশুদ্ধতা - ধরে পড়ে জাল জালিয়াতির - জোর চুরির - জঙ্গলে বন্য জন্তুর যখন একে একে শিকারী বা আততায়ীর হাতে মারা যায় তখন তার পদ্ধতিতে ধরে ফেলতে পারেন সেই আততায়ীকে। ভারতবর্ষে প্রতিটি ওয়াইল্ড লাইফে জিনগত প্রোফাইল তার স্বপ্ন ছিল। তাঁর হাত ধরে আন্দামানের উপজাতি মানুষগুলো জানতে পারে বিবর্তনের ধারায় আফ্রিকা থেকে কবে কোন রাস্তা দিয়ে কিভাবে আজ সে আন্দামানে পৌঁছেছে। এক নতুন তথ্য? এসবেরই জনক লালজি সিং।

ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। ভারতবর্ষের এত মানুষের মধ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে এত মিল এবং অমিলের যে বিবর্তন গত সমস্যা তার গিঁট ছাঁড়িয়েছে তাঁর আবিষ্কৃত ''বিকেএমপ্রব''। ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। বলেছেন- ভারত ও বায়োটেকনোলজিতে প্রথম সারিতে আসতে পারে। আমেরিকা তুমি কেমন দাদাগিরি করতে পারনা। আমরাও পারি। ভারতও করে দেখিয়ে দিতে পারে।

তার হাতে গড়া জিনম ফাউন্ডেশন গরীবদের বিনামূল্যে বংশগতি জেনেটিক রোগ নির্ধারণ ও নিরাময়ের

ব্যবস্থা করছে যা একজন বিজ্ঞানী নয় এক হৃদয়বান স্বপ্ন স্রষ্টার পক্ষে সম্ভব। ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে তার ভাবনা ব্যতিক্রমী। ভারতে প্রথম বন্যপ্রাণী মিউজিয়াম না বানিয়ে অন্য বন্যপ্রাণ ল্যাবরেটরি বানিয়েছেন। বিশ্বের প্রথম স্পটেড হরিণ কৃত্রিম ভাবে বানিয়েছেন। প্রতিটি বন্যপ্রাণীর জিনের সজ্জা একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে- এটাই তাঁর স্বপ্ন। আজ কিছুটা স্বার্থকও বটে। আজও পর্যন্ত তার স্বপ্ন কোন আমির কিনে পারেনি। তিনি আবিষ্কার করলেন মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্রোমোজোমে থাকা সেটেলাইট বডির আর ওর মধ্যে জিনসজ্জা কিভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করে। কিভাবে একটি ছেলে সাপ মেয়ে হয়ে সাপ হয়ে উঠতে পারে। এই লিঙ্গ পরিবর্তনের পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেন।

ইনি সেই বিজ্ঞানী যিনি আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যার মামলার সমাধান করলেন। তাঁর আবিষ্কৃত ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং পদ্ধতিটি তে তন্দুর মামলায় নয়না শাহানি হত্যার কিনারা করলেন। লালজি সিং তাইতো ফদার অফ বায়োটেকনোলজি।

আবার তিনি এই গোল্ডম্যান খ্যাত শ্রদ্ধামান বা প্রেমানন্দ মামলা এক ঝটকায় সমাধান করলেন। ভারতবর্ষের সবকটা ভণ্ড ধান্দাবাজ দুষ্কৃতির মুখো ছিঁড়ে মুখ বের করে ছেড়েছেন তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে। এই পৃথিবীর ফাদার ডিএন এ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয় এলেক জেফ্রিকে। কিন্তু ভারতবর্ষের ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিংয়ের জনক বলা হয় লালজি সিং। তাঁর পদ্ধতি অনন্য। খরচ কমিয়ে কীভাবে ভারতবর্ষ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এ স্বয়ম্ভর হতে পারে তার দিশা দেখিয়েছেন এই বিজ্ঞানী। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন সেখানকার উপাচার্য হলেন পদ্মশ্রী পেলেন ভাটনগর- জগদীশচন্দ্র ফেলোশিপ কি বাকি আছে তাঁর ঝুলিতে!

তিনি একজন বৈজ্ঞানিক না দেশভক্ত না শিক্ষক না গরিব দরদীকে উত্তর দেবে ? উত্তর দেবে আগামী প্রজন্ম। এক আদর্শ শিক্ষকের জীবন মন্ত্র- সাবজেক্ট বা বিষয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মানবতার গণিতে বিরাজ করে। যে শিক্ষক মানবতার গণিতে প্রবেশ করেন তিনি কেবলমাত্র শিক্ষক হবার অধিকার রাখেন। বিষয়ের বাইরেও যিনি আরও গভীর জীবন গড়ে তোলেন তিনিই তো শিক্ষক। আবার সমস্ত বিষয় ভুলে যাওয়ার পর যদি গোটা দেশ মনে রাখে তবেই তিনি শিক্ষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ছাত্র হওয়ার সুবাদে বেশ কবার লালজি সিং স্যারের ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল - বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেমিনারে তাঁর বক্তব্য শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। জীবনে একজন আদর্শ শিক্ষককে পেয়েছিলাম। তিনি শুধু ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ না করে পা রাখতেন মাটিতে। আর মাথা রাখতেন মানুষের হৃদয়ে।

"সভ্যতার সংকট"

অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' এখন। সমগ্র বিশ্ব আজ হিংসা ও সন্ত্রাসের মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের, এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের মধ্যে হিংসার তান্ডবতা দাবানলের লেলিহান শিখার মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে সমাজের মধ্যে শান্তি ও সুস্থিতি ব্যাহত হচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের নিস্পষণে মানুষের মন থেকেও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস, সততা, মানবতা, উদারতা প্রভৃতি মানবসত্তার বড়ো বড়ো গুণগুলি। কিন্তু কেন আজ মানবসত্তার এমন অবক্ষয়? কেন আজ 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ?

ক্যান্সার, এইডস্-এর মতো মারণ রোগের ওষুধ আবিষ্কারের পুরোপুরি সুফল নিশ্চয় একদিন আমরা পেয়ে যাবো, কিন্তু মানবসত্তার অবক্ষয়ের প্রতিকারের অষুধ কি আমরা কোনোদিন আবিষ্কার করতে সমর্থ হবো? বিশ্বাস, সততা, মূল্যবোধ প্রভৃতি মানবতার গুণাবলীই যদি মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে সভ্য সমাজে তার অস্তিত্বের মূল্য কতটুকু? সভ্যতা তবে কার জন্য? সভ্যতার সঙ্গে যদি মানবতার মেলবন্ধন না থাকে, তবে সেই সভ্যতার কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না। যার ফলে দেখা দিচ্ছে সভ্যতার সংকট।

সভ্যতার সংকটের ভয়াবহতা এখন সমাজের গভীরে প্রোথিত। সমাজ এখন নানা দূষণের ক্যান্সারে আক্রান্ত। কলুষিত সমাজ মানুষের মন ও বিবেককে দূষিত করে তুলছে। নবজাতকের কাছে এ পৃথিবীকে 'শিশুদের বাসযোগ্য' করে তুলবার জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তাকে আজও আমরা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। এই না পারা একবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি নাগরিকের কাছে চরম লজ্জা। এই লজ্জার জন্য আমাদের মনে কোনো আপশোস নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই — কেমন যেন সবাই নির্বিকার। আইনের সুশাসন 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' ভোট - রাজনীতির দৌলতে যথার্থ ন্যায় ও সত্যের প্রকাশ ঘটছে না। এভাবেই মানুষ ক্রমশ আদর্শভ্রষ্ট হয়ে, ন্যায়-নীতি-মানবতা বিসর্জন দিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তুলছে। সভ্য জগৎকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

একবিংশ শতাব্দী বিশ্বায়ণের যুগ। টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপ্‌টপ্, ইন্টারনেটের দৌলতে সমগ্র বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। বিশ্বায়ণের কল্যাণে পৃথিবীকে আমাদের কাছে আজ ছোটো মনে হচ্ছে। তাই মানুষ ভবিষ্যতের নবজাতকদের কথা ভেবে পাড়ি দিচ্ছে মঙ্গল গ্রহের দিকে। কিন্তু এই বিশ্বায়ণের সঙ্গে যদি মানবতার সম্পর্ক না থাকে, তবে তার সার্থকতা কোথায়? আমার নিকটতম যে প্রতিবেশী অভাবের তাড়নায় অশিক্ষার অন্ধকারে প্রতিনিয়ত ধুঁকছে, তার দিকে না তাকিয়ে যদি সুদূর মঙ্গল গ্রহের দিকে তাকাই, বিশ্বায়ণের বড়োবড়ো কথা বলি, — তাহলে সেই বিশ্বায়ণের স্লোগান বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে।

সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে, তত আমরা বিশ্বাস, মানবতা ও মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছি। যে সভ্যতার বুকে মানবতা নেই,ভালোবাসা নেই, মনুষ্যত্ব নেই, সেই সভ্যতার কোনো মূল্যও নেই। এভাবে আমাদের সকলের পাপে

সভ্যতা ক্রমশ কলুষিত হয়ে উঠছে। আমরা নিজেদের খুব উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র ও সভ্য বলে বড়াই করি, কিন্তু সমাজের উন্নতির বিকাশে কোনো অবদান রাখিনা। একজন পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ মানুষকে আলোর পথ দেখাইনা, তাহলে সেই শিক্ষার মূল্য কোথায়? একজন সভ্য নাগরিক হয়ে সমাজের জন্য যা করা উচিৎ, আমরা তা করি না। তখনই তো আমরা হয়ে পড়ি সভ্যতার কলঙ্ক। আমাদেরই কর্মফলে তৈরি হচ্ছে সভ্যতার সংকট।

তাই সময় এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবার। ন্যায় নীতির দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, সততা, মানবতা ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজে কেবল শিক্ষিত হলেই হবে না, প্রতিবেশীকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। ভালোবাসতে হবে। 'জীবে প্রেম' এর দ্বারাই আপনার আত্মশুদ্ধি ঘটাতে হবে, সভ্যতার কলঙ্ক মোচন করতে হবে। সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট বিলোপসাধন করে তার বিকাশের স্বাভাবিক চলার পথকে উন্মুক্ত করতে হবে।

সভ্যতার স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করা কোনো সভ্য মানুষের উচিৎ নয়। কিন্তু কোনো সভ্য মানুষ যদি সেই অনুচিৎ কাজটিই করে থাকে, তখনই সে হয়ে ওঠে সভ্যতার কলঙ্ক। অতিরিক্ত লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ মনোভাব আমাদের ক্রমশ সভ্যসমাজের পরিপন্থী করে তুলছে। উদার মানবিক সত্তাকে হারিয়ে আমরা ক্রমশ সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে পড়ছি। আমরা সভ্যতার মানবিক মুখকে হত্যা করে তাকে অস্তিত্বহীন করে তুলছি। তাইতো দেখা দিচ্ছে সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট।

কীভাবে আমরা এই কলঙ্ক মোচন করব? কীভাবে সভ্যতার সংকট দূর হতে পারে? এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজেদেরকে সৎ ভাবনার পথে চালিত করা। সৎ ভাবনা, সৎ চেষ্টা, সৎ কর্মের মাধ্যমে নিজেদের বিবেককে পরিশুদ্ধ করে তোলা, ঈশ্বরসেবা মনে করে সকল মানুষকে ভালোবাসতে হবে। উদার মানবতাবাদে দীক্ষিত হয়ে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে হবে। কিন্তু এটা এত সহজ ব্যাপার নয় — তা একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এভাবে শৈশব থেকেই সুশৃঙ্খল হয়ে সুস্থ রুচির অধিকারী হয়ে, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে পারলে সভ্যতা কলুষমুক্ত হয়ে উঠবে। সমগ্র মানবজাতির এখন সেই সাধনাই করা উচিৎ।

কন্যাশ্রী প্রকল্প

কৃষ্ণকলি বর্মন
বাংলা অনার্স, ফার্স্ট সেমিস্টার

বঙ্গ প্রকৃতির উপাদান গুলি যেমন মানব জীবনকে এগিয়ে চলতে সহায়তা করেছে, 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিশেষ অঙ্গ যা প্রত্যেক মেয়েদের শিক্ষার প্রগতিকে এগিয়ে চলতে সহায়তা করেছে। নতুন ভাবনা ও নতুন উদ্ভাসনে সৃষ্ট এই 'কন্যাশ্রী প্রকৃল্প', মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবর্তিত গতিধারা, খাদ্য সাথী, সবুজ সাথী, জলধারা, যুবশ্রী এই সকল নানান প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল এই কন্যাশ্রী প্রকল্প।

কন্যাশ্রী প্রকল্প উদ্ভাসনের কারণ ঃ— প্রত্যেকে সমাজ নারী পরিচালিত সমাজ। যে নারী সমাজ গড়ে, নতুন সৃষ্টি করে সেই নারীই সমাজে নির্যাতিত, চক্রান্তের স্বীকার। এই পিছিয়ে পড়া নারীদের নতুন পথে এগিয়ে যেতে, জীবনকে সুন্দর করতে, নিজেদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে রাজনৈতিক অমূল্য সৃষ্টি 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। এই সকল নানান প্রকল্প সৃষ্টির ফলে মেয়েরা আজ সমাজের পথে এগিয়ে, নতুন সৃষ্টির পথিকৃৎ রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছে।

সহায়তা প্রদান ঃ— যে সকল পরিবারের পারিবারিক আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকার কম সেই সকল পরিবারের মেয়েদের জন্য বিশেষত তৈরী হয়েছিল এই 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। বর্তমানে সকল অবিবাহিত মেয়ে, যারা শিক্ষার অঙ্গনে রয়েছে তাদের জন্য এই 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সহায়তা স্বরূপ ১৮ বছরের নিম্নে থাকা কন্যাশ্রীর আওতাভুক্ত মেয়েরা বছরে ৭৫০ টাকা অনুদান পেয়ে থাকে, এবং এককালীন ২৫০০০ টাকা পাবে - ১৮ বছর পুরন হলে।

আর্থিক সুবিধার বিষয় ঃ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর নাম কন্যাশ্রী।

এই প্রকল্পটিতে তিন ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

(ক) K1 - বার্ষিক বৃত্তির পরিমান ৭৫০ টাকা ১৩ - ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের জন্য এই টাকা দেওয়া হবে।

(খ) K2 - এককালীন এই বৃত্তির পরিমান ২৫,০০০ টাকা। বৃত্তিদানের বছরে অনূর্ধ্ব ১৯ এবং ১৮ বছর অতিক্রান্ত অবিবাহিত মেয়েরা এই বৃত্তি পাবে।

J. J. Act, 2000-এর অধীনস্থ আবাসের আবাসিকরাও এই বৃত্তি পাবে।

(গ) K3 - যে সমস্ত কন্যাশ্রীরা ৪৫% নম্বর সহ স্নাতক হয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হবে তারা বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনার জন্য মাসে ২৫০০ টাকা ও কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য মাসে ২০০০ টাকা অনুদান পাবে।

আবেদন পত্রের বিষয় ঃ—

রাজ্যের কিশোরী মেয়েদের প্রত্যেকের বিদ্যালয়ের আঙিনায় আসার নাম কন্যাশ্রী প্রকল্প।

এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে আবেদন পত্র পাওয়া যাবে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পুরসভা, সমস্ত মহকুমা থেকেও এই আবেদনপত্র মিলবে। উপভোক্তাদের সুবিধার্থে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যক।

ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে NEFT পদ্ধতিতে বৃত্তির টাকা পৌঁছে যাবে।

কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন ঃ—

পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। সকল মেয়েকে নিজ জীবনে স্বাবলম্বী করতে এবং প্রত্যেকটি দিনে নিজেকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পথিকৃৎ এই 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' বিশ্বসেরা উন্নতি প্রাপ্ত' কন্যাশ্রী প্রকল্পকে' এগিয়ে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৪ই আগষ্ট দিনটিতে 'কন্যাশ্রী দিবস' পালিত হয়ে চলেছে।

পরিবর্তিত সমাজ ঃ—

বর্তমান সমাজ যতই আধুনিকের ছোঁয়ায় নিজেকে সাজিয়ে তুলুক, কোথাও সমাজের আনাচে কানাচে লুকিয়ে রয়েছে পুরোনো কুসংস্কার, নিজেকে আটকে রাখার মানসিকতা। এই অরাজক, নির্যাতিত পরিবেশ হতে মেয়েদের রক্ষার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনন্য প্রয়াস 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। কেবল অর্থ সহায়তা করে নয়, এই কন্যাশ্রীর হাত ধরেই সমাজে কমে গিয়েছে ৫৬ শতাংশ স্কুলছুট, ৩৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ, কমে গিয়েছে শিশুশ্রম। যার অন্যতম আইকন মুর্শিদাবাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জুলেখা খাতুন।

সম্মান প্রাপ্তি ঃ—

"কন্যাশ্রী কন্যাশ্রী,
কন্যাশ্রীর পর যুবশ্রী,
কন্যাশ্রী আর যুবশ্রী মিলে
নতুন প্রয়াস বিশ্বশ্রী।।"

সচেতন ও উন্নত সমাজ গড়ার প্রয়াসী 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'-কে সম্মানিত না করলে সমাজে নারীর উদ্ভাসন বৃথা।

সবকিছুকে ছাড়িয়ে ২০১৭ সালের 'পাবলিক সার্ভিস' পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। চারিদিকে আজ কন্যাশ্রী, কন্যাশ্রী জয় জয়াকার, যে কন্যাশ্রী 'রাষ্ট্রপুঞ্জের পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডের' অংশীদার। এ যেন আন্তর্জাতিক সম্মানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্যের রূপ যা ৬২টি দেশের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে লড়াই করে ছিনিয়ে নিল মেয়েরা।

কন্যাশ্রীর সংখ্যা ও লোগো ঃ—

মেয়েরা যেন কেবল পর্দা প্রথার আড়ালে বন্দি। নিজেদের ইচ্ছা ছিল মূল্যহীন, কত মেয়েরা নিজেদেরপ্রতিভা করেছে শেষ,নিজেদের কাছে আত্মহত্যার পাত্রী। সবই এই সমাজের দোষ। পুতুল খেলার বয়সে ছাড়তে হয়েছে স্কুল, হতে হয়েছে দুষ্টের স্বীকার। তাই এই সকল বর্বরতা যাতে আর কোনো মেয়েকে আটক করতে না পরে তাদের হাত ধরেছে এই 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। মাত্র কটি দিনের মধ্যে কন্যাশ্রী তার সাথে পেয়েছে ৪০ লক্ষ ৩১ হাজার ছাত্রীকে। যারা হয়তো এই কন্যাশ্রীর হাত ধরেই আজ স্বাবলম্বী।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের এই লোগোটির মধ্য দিয়েই এই প্রকল্পের বিষয়টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এই লোগো সকল কন্যাশ্রীকে বার্তা দেয় কেবল অপরের জন্য মেয়েরা নয়, মেয়েরা হোক নিজের জন্য, এগিয়ে যাক বড়ো হওয়ার পথে।

স্বীকৃতি প্রদান ঃ—

সারাদেশের প্রত্যেকটি বাড়িতেই রয়েছে কন্যা সন্তান। এদের মধ্যে কেউবা পড়াশুনাতে ভালো, কেউবা খেলাধুলায়, কেউ বা অন্য বিষয়ে। সেই সকল মেয়েদের কন্যাশ্রীর অর্থ দানের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে দিয়েছেন বিজয়ীর মুকুট, কারও হাতে বা তুলে দিয়েছেন বিজয় শিরোপা। এমনই একজন

কন্যাশ্রী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে। অভাবের মধ্যেও শুরু করেছিল তীরন্দাজির অনুশীলন। সেই মনিকা সোরেনই জঙ্গলমহলের থেকে চিনা তাইপেতে এশিয়া জয়ী। মমতা ব্যানার্জীই আজ তার হাতে তুলে দিয়েছে কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিরন্দাজীর তলোয়ার, মাথায় রেখেছে নিজের হাত, এই কন্যাশ্রীকে দিয়েছে আশ্বাস, দিয়েছে তার স্বীকৃতি।

সারা পশ্চিমবঙ্গ আজ গর্বিত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সম্মান লাভ করে। কেবল কন্যাশ্রী নয় আরও অনেক অনেক প্রকল্প, খাদ্য সাথী, সমব্যাথী, শিক্ষাশ্রী আরও কত নতুন প্রয়াস। সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিশুদের বিনামূল্যে ব্যাগ, বই, খাতা বিতরন, খাওয়ার ব্যবস্থা, স্কুল পোশাকের উন্নতি। সবই কী কেবল নিজের সম্মান রক্ষার্থে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস... কখনই তা নয়, সকল কন্যাকে নারীর সম্মানে উন্নীত করতে, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে, রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার এ এক নতুন প্রয়াস।

সেরার সেরা শিরোপা প্রাপ্ত 'কন্যাশ্রী', সকল মেয়েরা হোক এর অধিকারিনী।

সব মেয়েরা তাই জোর গলাতে, সম্মানের সাথে, গর্বিত হয়ে উচ্চারণ করুন —

"সব মেয়েরা এক হয়েছি
রেখেছি হাতটা হাতে,
ভয়টা কী আর চলার পথে
কন্যাশ্রী আছে সাথে।।"

এক নির্জন অন্ধকার রাত

বিশ্বজিৎ সাঁতরা
এডুকেশন অনার্স (ফার্স্ট সেমেস্টার)

আমি আর আমার বন্ধু নীলাঞ্জন। যাকে আমি নীল বলে ডাকি। একদিন আমরা দুজন বসে ঠিক করলাম দুজন মিলে ময়নায় রাসের মেলা যাব। বিকেলে দুজনে ভালো করে জামা কাপড় পরে ও দুজনে দুটি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ময়না রাস যাওয়ার পথে। এই ছিল আমার জীবনে প্রথম সাইকেল নিয়ে প্রায় ৩ ঘন্টা পথ সাইকেলের সাথে কাটানো। আমি ঠিক রাসের মেলা যাওয়ার পথ জানতাম না। আমার বন্ধু নীল আমায় ভরসা দিল চল আমি তো জানি। তাই আমি তার সাথে পথ চলতে লাগলাম। দুজনে গল্প করতে করতে মেলায় পৌঁছে গেলাম। তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা।

মেলাতে পৌঁছে প্রথমে ঠাকুর দর্শন করলাম। তারপর নীলাঞ্জন বলল তুই কী কিনবি কেনাকাটা করে নে আর আমি খেয়ে আসি কারণ আমার বন্ধু নীল ছিল একটু পেটুক প্রকৃতির। তখন আমি বললাম তুই খেয়ে আয় আর এসে এখানেই দেখা করিস। তখনি আমি চলে গেলাম শীতের পোশাক দোকানে কারণ আমার মায়ের জন্য চাদর, বাবার জন্য একটি জ্যাকেট কিনতে। আর আমি একটি গল্পের বই কিনলাম কারণ আমি গল্প পড়তে খুবই ভালোবাসি। কেনার শেষেই দেখা হল নীলের সাথে আমি বললাম চল একটু মেলায় ঘুরে নেই। তারপর বাড়ি ফিরে যাব। মেলাতে ঘোরার পর যখন বাড়ি আসার জন্য তৈরি হলাম তখন ঘড়ির কাঁটাতে বাজে এগারোটা চল্লিশ। দুজনে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়িতে ফিরবার জন্য।

দুজনে সাইকেল নিয়ে আর হাতে মোবাইলের আলো জেলে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। ঠিক ঘড়ির কাঁটাতে বাজে বারোটা দশ। চারিদিক নিঝুম অন্ধকার কোথাও কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ করেই আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যায়। চারিদিকে এত অন্ধকার কোনো গাছপালা দেখা যাচ্ছে না। আমি তখন ভয়ে ভয়ে বললাম নীল এখন কী হবে। নীল আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল আমার তো মোবাইলে আলো জ্বলছে। কিছুক্ষন পরে দেখা গেল কিছুটা দূরে কোনো মোমবাতির আলো টিম টিম করে জ্বলছে। তারপর নীল বলল চল ওখানে যাই নিশ্চয়ই কোনো মানুষের সাহায্য পাব। গিয়ে দেখি এক পুরানো বাড়ি। ভিতরে কেউ যেন গুন গুন গান গাইছে। আমার মন তখন ভয়ে বড়সড়। তারপর নীল বলল বাড়িতে কেউ আছেন? তখন বাড়ির ভেতর থেকে মৃদু সরে ভেসে আসতে লাগল বয়স্ক কোনো ব্যাক্তির কণ্ঠস্বর। বলতে লাগল "কে বাছারা এত রাতে এখানে কী চাই?" আমি বললাম আমাদের একটু সাহায্য করুন না। আজকের রাত যদি এখানে থাকতে দেন কাল সকাল হলেই চলে যাব। তারপর সেই বয়স্ক মহিলারা বলল ভেতরে এসো। আমি আর আমার বন্ধু নীল ভেতরে প্রবেশ করে দেখি কেউ কোথাও নেই। চারিদিক ঘন অন্ধকার কিছুক্ষন পর চোখে পড়ল মোমবাতিটা টেবিলের উপর জ্বলছে। আমার মন তখন ভয়ে আতঙ্কিত। কিছুক্ষন পর ঝড় ঝড় শব্দ বাড়ির জানালা খুলে গেল আর এক বিকট শব্দে দরজা খুলে গেল। আমার মনে তখন ভয়ের আতঙ্ক আরো বাড়তে লাগল। দরজার কাছ থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এসে বলল তোমরা দাঁড়িয়ে কেন এখানে বসো। মহিলাটি বলল তোমরা কোথা থেকে এসেছ আমি বললাম আমরা নন্দকুমার থানার অন্তরবর্তী ঠাকুরচক্ গ্রাম থেকে এসেছি। আমরা তিনজন গল্প করতে করতে কখন জানি না বিছানার উপর আমি ও আমার বন্ধু নীল ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙ্গেই দেখি রাত প্রায় দেড়টা বাজে। পিছন ফিরে তাকাই যেই স্থানে মহিলাটি বসে ছিল সেই স্থানে একটি

কালো বিড়াল বসে আছে। আমার মন তখন ভয়ে জর্জরিত। আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকার আমার বন্ধু নীলকে ডাকতে লাগলাম। নীল নীল ওঠ, ওই নীল একবার ওঠ না। নীল তখন ঘুমে অচৈতন্য আমার মনে ভয় আরো জাগতে থাকে। তারপর আমি ডাকতে শুরু করলাম ঠাকুরমা ঠাকুরমা আপনি কোথায়। কোথাও কোনো সাড়া মিলল। একটাই শব্দ কানে ভেসে আসছে। বাইরে পেঁচার ডাক আর তার সাথে কেউ যেন মৃদু স্বরে কাঁদছে। আমার বুকের ভিতর রক্ত শীতল হয়ে আসছে। হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দ তারপর আমি জ্ঞান হারাই। সকালে দুজনে অনেক খোঁজার পর কাউকে না দেখতে পেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়িতে ফেরার জন্য। কিছুক্ষন পর পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা। দেখে মনে হয় আশেপাশে কোথাও থাকে। আমি সেই ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম কাকামশাই ওই যে পুরানো বাড়িটি ওখানে কে থাকে। সেই ব্যাক্তি কিছুক্ষন নিরব থাকার পর বলল তোমরা কি কিছুই জানো না। আমি বললাম কেন। তখন সেই ব্যাক্তি বলল আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে এক বৃদ্ধা মহিলা বিষ খেয়ে ওই বাড়িতে মারা গেছে, সবাই বলে ওই বৃদ্ধার আত্মা ওই বাড়িতে বসবাস করে। তখনি আমার মনে পড়ে কাল রাতে যে বৃদ্ধা মহিলার সাথে কথা বলেছিলাম তিনি মানুষ নয় আত্মা ভয়ে তখন প্রায় আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। তারপর বাড়িতে ফিরে এলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই মেলায় যাওয়ার কথা বললে আমার গা শীতল হয়ে আসে।

মরোনোত্তর দেহদান

সৌরভ সাহু
ভূগোল, দ্বিতীয় বর্ষ

ভূমিকা ঃ—

'দান ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম'

দানের ঋণ কখনোই পরিশোধ্য নয়।

জীবনে বহুবিধ মহৎ কাজের মধ্যে দান অন্যতম। তা সে যে-কোনো রকমের দাতাই হোক - ক্ষধিতকে অন্যদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, তৃষ্ণার্তকে বারি দান, অসহায় দুর্বলকে সাহায্য দান। স্বত্ব ত্যাগ পূর্বক যে কোন দানকে বলে সম্প্রদান। ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, তাই সম্প্রদান কারক। কেননা ভিক্ষুককে ভিক্ষা স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা হয়। এই ভিক্ষাদান যেমন শাস্ত্রীয় কর্তব্য, তেমনি মানবিক কর্তব্য হল দেহদান, চক্ষুদান, রক্তদান প্রভৃতি দান। কারণ এই সব দানের দ্বারা প্রাণ দান করা হয়।

মৃত্যুর পর যদি সেই দেহ ও চক্ষু অপরকে জীবন ধারনের জন্য দান করে দেওয়া যায়। তাহলে দাতার কোন ক্ষতি হয় না, বরং তা মুমূর্ষ জীবনের বাঁচার সহায়ক হয়ে উঠে। তাতে অন্ধ পায় আলোর সন্ধান, জগতকে নতুন করে দেখবার আশ্বাস।

মানবিক কর্তব্য ঃ—

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা বা দাহ করা বহুদিনের শাস্ত্রীয় বিধি। মানবদেহের মতো মূল্যবান একটি সম্পদের এভাবে অপচয় হওয়া সমর্থন করা যায় না, যুক্তিযুক্তও নয়। সে কোন শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জীবনদশায় যদি এইডসের মত বদ রোগ কিংবা ছোঁয়াচে রোগ বাসা না বেঁধে থাকে তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যুর পর চোখ (কর্নিয়া), যকৃত, কিডনি, চামড়া, স্টেমসেল সহ বহু অঙ্গ-প্রতঙ্গ মানুষের দেহে সংস্থাপন করা যায়। তাতে বিকলাঙ্গ মানুষ আবার অঙ্গ ফিরে পায়। তাই মৃত্যুর পর দেহদান ও চক্ষুদান-এর জন্য প্রচার করা হচ্ছে মানুষের কাছে।

দেহদানের গুরুত্ব ঃ—

অন্ধ লোকেদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয় চোখের। সেই চোখ যদি মৃত্যুর পর সংরক্ষিত করে রাখা হয়। তাহলে তা জীবিত ব্যক্তির পক্ষে নতুন করে আলো দেখার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একজনের চক্ষুদানের গুরুত্ব এত বেশী। গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের একটিমাত্র মৃতদেহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ১৪ জন অসুস্থ মানুষ উপকৃত হতে পারে। মূল কথা হল— মানুষ মারা যাওয়ার পর তার মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগানো কারো সদিচ্ছা থাকলেই তা করা যায়। কিন্তু দেহ গুলিকে পুড়িয়ে তা ক্ষতিই হয়।

প্রতিবন্ধকতা ঃ—

মানুষের কুসংস্কারই এই কাজের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। মৃতদেহকে অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে তা মানব কল্যাণে অর্পন করাই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে যিনি দেহ বা চক্ষুদান করবেন তিনি যেন শুধু নির্দিষ্ট ফর্মে সই করেই ক্ষান্ত না হন। পরিবারের সদস্যদেরও তিনি সচেতন করেন। যাতে মৃত্যুর পর তার চক্ষু ও দেহ সংরক্ষিত হওয়ার কোন অসুবিধা না হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। যাতে এই দান পর্বের পর সেগুলিকে যথারীতি ভালোভাবে সংরক্ষন করা যায়।

মহৎ দান ঃ—

'মরোণোত্তর দেহদান' মানবতার জন্য হোক আপনার সর্বশেষ দান। এই প্রক্রিয়াটি খুব জটিল কিছু নয়। অঙ্গীকারপত্র ও হলফনামায় সম্মতিদানের মাধ্যমে নোটারি - পাবলিক করলেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। যেকোন দানই মহত্বের। পুষ্প তার নিজের জন্য ফোটে না, পরের জন্য তার হৃদয় কুসুমকে বিকশিত করে। তেমনি মানুষ যদি মৃত্যুর পর তার দেহ ও চক্ষুকে অপরের জন্য দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, তাহলে তা নিঃসন্দেহে উপকারে আসে। প্রশ্ন আসতে পারে, মৃত্যুর পর চোখ তুলে নিলে চোখের অবস্থানটা দেখে প্রিয়জনেররা আতঙ্কিত হবার কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ স্থানে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করে এমনভাবে কৃত্রিম চোক স্থাপন করে দেন, তা বোঝার উপায় থাকে না। বরং এই চোখটির দ্বারা অন্য একজন যদি পৃথিবীর আলো দেখতে পায় তা তো প্রিয়জনদের কাছে গৌরবের বিষয় হয়ে উঠে। পুড়িয়ে ফেললে তা সব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ঐ চোখ যদি অন্য জনের কাছে থাকে তাহলে মরেও সে অমর হয়ে থাকে।

আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং আরো অনেকে বিশিষ্ট জন তাঁদের চক্ষু ও দেহদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

উপসংহার ঃ—

দানসেবায় মানুষ এভাবেই মনুষ্যত্বের পরিচয় রেখে আসছে। এই অবক্ষয়ের যুগে নীতি - ধর্মহীনতা ও ভ্রষ্টাচারীতার কথা যতই বলে থাকি, আজও মানুষের হৃদয় মানুষের জন্য কাঁদে, সে অপরের ব্যাথায় ব্যথিত হয় অপরের বিপদে নিজেকে বিপন্ন মনে করে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে এ ব্যাপারে যৌথ ভূমিকা গ্রহণ করে চক্ষুদান ও দেহদানকে আরো বেশী কার্যকরী করে তুলতে হবে। বিভিন্ন গন মাধ্যমে প্রচার করে, মানুষ যাতে আগ্রহী হয় তা দেখতে হবে। শুধু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেই হবে না, যারা চোখ ও দেহ গ্রহণ করবে — সেই সংস্থার উচিৎ যাতে মৃত্যুর পর সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারা। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামো, সচেনতা ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী।

Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

পল্লবি দাস
(প্রথম প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা)

ভূমিকা ঃ—

বর্তমানকালে আমাদের সবার মধ্যে যেন এক দ্বিতীয় সত্তা বা একধরনের অশরীরি আত্মা কাজ করছে। ছোটো ছোটো কাজেই সেই অশরীরি আত্মার প্রয়োজন অনুভব করি, যেমন। যদি আমাদের কোথাও বেড়াতে যাওয়ার হয় কোথায় কী আছে তা আমরা ইন্টারনেটে সার্চ করে জানতে পারি, অজস্র বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে আমাদের সমানে।

আমরা প্রতিনিয়ত যে সব ডিভাইস ব্যবহার করে চলেছি, আমরা এত পরিমানে মগ্ন হয়ে থাকি যেন প্রতিনিয়ত ওই ডিভাইসগুলো আমাদের পর্যবেক্ষন করে চলেছে, প্রতিনিয়ত ব্যবহার সত্ত্বেও মাঝেমাঝে মনে হয় এসব ডিভাইসের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রন নেই। এসবই হল 'Aritificial Intelligence' বা 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'। আপনি কী চাইছেন তা সেকেন্ডের আগেই ট্রিলিয়ন লজিক ক্যালকুলেশন করে আপনার সামনে হাজির করবে।

সাধারন অর্থে **Aritificial Intelligence (AI)** ঃ—

"Artificial Intelligence sometimes called Machine Intelligence." —

'Artificial Intelligence' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' যেখানে মেশিন দ্বারা মানবিক বুদ্ধি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে যন্ত্র রূপে প্রকৃতিস্থ করা হয়ে থাকে, তাকে সাধারন অর্থে 'Artificial Intelligence বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে **Artificial Intelligence** ঃ—

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বা Artificial Intelligence (AI) কে বিশেষভাবে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে ধরা হয়। AI (Artificial Intelligence) হল কম্পিউটার বিজ্ঞানের সেই শাখা বা অংশ যেখানেশুধুমাত্র বুদ্ধিমান যন্ত্র বা মেশিন তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলো মানুষের মতো আচরন করে থাকে, যেমন — Robot। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর সহিত কম্পিউটারের কিছু কাজ করা হয়ে থাকে শিক্ষা, বক্তৃতা স্বীকার প্রভৃতিকে এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বর্তমান সময়ে AI একাডেমি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় যেখানে কম্পিউটারের Hardware ও Software কীভাবে বানানো হয় যার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হয়।

সৃষ্টির ইতিহাস ঃ—

1955 সালে 'Newell' এবং 'Simon'-এর 'Logic Theorist' হল 'Modern Artificial Intelligence' -এর উন্নয়নের দিকে অধিকতর পদক্ষেপ। এটিকে AI-এর প্রথম কার্যক্রম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যে মানুষটি প্রথম Artificial Intelligence-এর পরিভাষা উদ্ভাবন করেন এবং নিরীক্ষন করেন তিনি হলেন 'John Mc Carthy' - ইনি Artificial Intelligence-এর জনক হিসেবেও পরিচিত।

১৯৫০ সালে ইংরেজ গনিতবিদ Alan Turing একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন 'Computing

Machinery and Intelligence' নামক, সেটি AI-এর একাধিক দরজা খুলে দেয় যেটি AI নামে পরিচিত। যা কিছু বছর আগে সমাজ John Kc Carthy-এর উদ্ভাবিত এবং নিরীক্ষন করা 'Artificial Intelligence'-এরপরিভাষা গ্রহন করে।

AI-এর ধারনা ঃ—

AI হল কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে শুধুমাত্র মেশিন তৈরীর ওপর বা যন্ত্র তৈরীর ওপর জোর দেওয়া হয় যেগুলো মানুষের মতো আচরন করে, মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে, এটি হল 'Artificial Intelligence'।

কার্যক্ষমতা ঃ—

AI হল মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত মানবিক বুদ্ধিবল, বিশেষত কম্পিউটার বিজ্ঞানের। AI-এর নির্দিষ্ট প্রয়োগ বিশেষজ্ঞদের ধরন, নিয়মাবলি, বক্তৃতা স্বীকারও শিক্ষাগত দিক এবং যান্ত্রিক দৃষ্টিকে এর অন্তর্ভুক্ত করে।

ভবিষ্যৎ ঃ—

আমরা সবাই এই ব্যাপারে অবগত যে AI হল মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত মানবিক বুদ্ধিমত্তা। একাধিক অর্থে এটি হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মেশিনগুলি মানবিক বুদ্ধির নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ-এর প্রদর্শন দিয়ে থাকে, যেমন — শিক্ষা, যুক্তি। যেহেতু এটি একটি আরম্ভ, AI-এর দ্বারা কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব উন্নতি প্রদর্শন করানো হয়ে থাকে।

AI ব্যবহারের সুবিধা ঃ—

AI হল যন্ত্রবিশেষ, যাকে এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে সেগুলি মানুষের মতো আচরন করতে ও মানুষের মতো ভাবতে পারে। যাকে এককথায় বলা হয় 'যন্ত্ররূপী মানুষ'।

আমাদের জীবন আজ যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রের ওপর নির্ভর করেই মানুষের জীবনের গতি ছুটে চলেছে। তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবন আজ প্রায় AI-এর ওপর নির্ভরশীল। AI আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের জীবনধারা এমন পরিবর্তিত AI-এর দ্বারা কারণ এই প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের প্রতিদিনের কাজে এক বিস্তর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যেমন —

* ব্যাঙ্ক এবং অর্থনৈতিক দিক ঃ—

ব্যাঙ্কগুলি AI-এর ব্যবহারের মাধ্যমে একাধিক কাজ একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। AI-এর ব্যবহার বিভিন্ন ব্যাপার যেমন 'Investing money in stock', 'financial Operation', Managing Different Properties', প্রভৃতি কাজে একজন মানুষকে নিজের পারদর্শিতার দ্বারা হারিয়ে দিতে সক্ষম।

* চিকিৎসাবিজ্ঞানে AI ঃ— AI প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুখমণ্ডলই পরিবর্তন করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে AI কে অনেকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং তাকে অবিশ্বাস্য মূল্য ও দেওয়া হয়। AI কে কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য যত্ন সহায়ক (virtual health care assistant) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

* Heary Industries ঃ আজকাল বড়ো বড়ো কোম্পানী গুলিতে জিনিসপত্র তৈরী করা হয় নির্দিষ্ট বিভাগে বা নির্দিষ্ট Production Unit-এ। যেখানে Robot বা মানুষরূপী যন্ত্র দ্বারা এসব কাজ করানো হয়ে থাকে। জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহন করা, কত জিনিস তৈরী হচ্ছে তার হিসেব

রাখা, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করা প্রভৃতি কাজে এদের অসীম পারদর্শিতা দেখা যায়।

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন — Research lab, Air transport এ, Gaming Zone প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর পারদর্শিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

AI-এর ব্যবহারের অসুবিধা ঃ—

প্রযুক্তিবিদ্যাযেমন আমাদের জীবনকে গতিশীল ও করতে পারে তেমনই একাধারে আমাদের জীবনের গতিরুদ্ধও করতে পারে। যেমন আমরা এর সুবিধাগুলি উপভোগ করি তেমনই অসুবিধাগুলিকেও এড়িয়ে যেতে পারিনা।

* AI প্রযুক্তি বিদ্যাযেমন 24/7 কোনো বিরতি ছাড়াই কাজ করে তেমন যান্ত্রিক হওয়ায় এগুলিকে মাঝেমাঝে সারাতেও হয়। ইংরেজীতে বলতে গেলে 'Programs need to be updated to suit the changing requirements, and machines need to be made smarter' — এগুলি করতে গেলে বা মেশিনের কোনো গন্ডগোল দেখা দিলে তা সারাতে গেলে অনেক মূল্যের প্রয়োজন হয়।

* প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন মানুষেরসব কাজকে সহজ করে দেয় তেমনি প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি যে মানুষের নিজের বুদ্ধিশক্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। 'Dependingon Artificial Intelligence, human lost their own thinking capacity.'

* যদি এই ধরনের মেশিনের নিয়ন্ত্রন কোনো খারাপ হাতে চলে যায় তাহলে সেটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। কারন মেশিনরা কোনো কাজ করার আগে ভাবতে পারেনা। কেউ যদি যন্ত্রকে খারাপভাবে পরিচালিত করে তাহলে তা সব ধ্বংস করতেও সক্ষম হবে

* অতিরিক্ত যান্ত্রিক ব্যবহার মানুষকে ক্রমশ মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থে পরিনত করছে।

উপসংহার ঃ—

AI প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহন করে রয়েছে। ছোটো থেকে বড়ো সমস্ত রকম কাজে মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে কাজের চাপ কমানোর জন্য এবং কাজকে সহজ করার জন্য। এই প্রযুক্তিবিদ্যা এতটাই অগ্রীম যে কোনো কাজ এর জন্য লিখে দিতে হয় না কাজের গতি একা একাই এগিয়ে যায়।

Sea horse ও তার বাচ্চা প্রতিপালন

মৌসুমি ঘোড়ই
(প্রাণীবিদ্যা, ফোর্থ সেমিস্টার)

আজকে এমন একটা প্রানীর কথা বলব, যার সাথে আমরা অনেক ছোট বেলা থেকেই পরিচিত। ওর নানান খেলা দেখেছি টিভির পর্দায় ও মনে মনে রূপকথার দেশে কল্পনা করেছি ও প্রানীর সাথে খেলছি, সময় কাটাচ্ছি, সেই প্রানীটি হল Sea horse। হ্যাঁ সমুদ্র ঘোড়া, ছোট বেলায় কার্টুনে এই অদ্ভূত প্রানীর সাথে আলাপ টিভির পর্দায় বড় হওয়ার সাথে সাথে ওই প্রানীর সম্বন্ধে জানার এক প্রধান ইচ্ছা মনে জন্মাতে লাগল, নানা প্রশ্ন মনে আসতো, আচ্ছা এটা যদি মাছ হয়, তবে মাছের মতো দেখতে নয় কেন? কেন এরা উল্লম্বভাবে থাকে? আচ্ছা ওদের বাচ্চাদের কীভাবে আদর-যত্ন করে?? এই রকম অদ্ভূত ধরনের প্রশ্ন মনের কোনে আঁকি-বুকি কাটতো, সেই সমস্ত প্রশ্নের তাড়নায় একদিন ওই প্রানীর সম্বন্ধে কিছু জানার দেখার এক অদম্য ইচ্ছা জাগায় ফলে Google-এ গিয়ে Search করলাম কত অজানা তথ্য জানলাম! যেমন —

Hippocampus sp. হল Sea horse-এর বিজ্ঞানসম্মত নাম, যার phylum - কর্ডাটা ও Class - Actinoplerygu। এরা সাধারনত অগভীর ট্রপিক্যাল লবনাক্ত জলে থাকে। এরা বসবাস করে sheltered area-তে যেমন — sea grass beds, coral reefs অথবা ম্যানগ্রোভস অরন্য অঞ্চলের Root-এ।

Sea horse সাধারনত 1.5 - 35.5 cm দৈর্ঘ্যের হয়। এরা bony fish কিন্তু এদের কোন scale থাকে না। বরং স্কিন খুব পাতলা হয়। রিংগুলো সাজানো থাকে ওদের বডিতে প্রত্যেক species এর নির্দিষ্ট সংখ্যায় রিংগুলো স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত থাকে। তারা পৃষ্ঠীয় পাখনার সাহায্যে up-right সাঁতার কাটতে পারে। এদের কোন পুচ্ছ পাখনা থাকেনা। Sea horse এর গলা হয় সুগঠিত ও flexible.। মাথায় ক্রাউন-এর মতো spine বা শিং বর্তমান। যাকে বলা হয় — Coronet। পুরুষ Sea horse এর ventral position-এ একটি pouch থাকে। যাকে Brood pouch বলা হয়। যা স্ত্রী Sea hourse এর ক্ষেত্রে থাকে না। যখন পুরুষ ও স্ত্রী Sea horse এর মিলন হয় তখন স্ত্রী Sea horse, প্রায় 1500 অনিষিক্ত ডিম, পুরুষ Sea horse এর pouch এর জমা (deposit) করে। পুরুষ প্রায় 9–15 days ডিম গুলি বহন করে চলে, যত দিন না সম্পূর্ণ Sea horse -এ পরিনত হয় ততদিন। পুরুষ ও স্ত্রী এর মধ্যে জনন প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন, তারা একসাথে pre-down dances করে এবং তাদের tail intertwisting অবস্থায় থাকে, এবং একসাথে সাঁতার কাটে। এই সময় Male দের brood pouch এর অনিষিক্ত ডিম জমা হয়, ব্রুড পাউচ মাত্র 6 sec. এর জন্য খোলা হয়, সেই অনিষিক্ত ডিমগুলি, ব্রুডের মধ্যে থাকা Sea sperm এর সাথে fertilize হয়ে ছোট ছোট Sea horse এ পরিনত হয়।

যখন ছোট Sea horse গুলি পরিনত হয়। তখন পুরুষ Sea horse তার brood pouch কে বাচ্চা গুলিকে সমুদ্রের জলে ছেড়ে দেয় এবং Environment এর সাথে খাপ খাওয়াতে শেখায়। বন্দুক থেকে যেখাবে গুলি বেরোয় সেইরকম ভাবে বাচ্চাগুলো বাইরে বের করে। আবার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকলে, পুরুষ Sea horse বাচ্চাগুলিকে আবার Brood pouch এর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। এইপুরুষ Sea horse কে Sea Mr. Super Mom বলা হয়। এরা একসময় পরিনত বাচ্চাগুলিকে সুমদ্রের জলে ছেড়ে দেওয়ার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ভাবতেও অবাক লাগে, যে সব কষ্ট সহ্য করে বাচ্চাগুলিকে পৃথিবীর মুখ দেখাল, তারই আর নিজের সন্তান দেখার সাধ আর পূরণ হলনা, কারণ— পুরুষ Sea horse বাচ্চা, লালন-পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ফেলে, এবং যখন বাচ্চাগুলি brood pouch থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে, তখন, তার বাবা চিরনিদ্রায় চলে যায়।

সভ্যতার অগ্রগতি — আধুনীকরন

তমালিকা দাস
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ফোর্থ সেমিস্টার)

বর্তমান সাল 2019 এ দাঁড়িয়ে যদি মানব সভ্যতার অগ্রগতিরকথা বলা হলে অনেকেই তা সহজে বলতে পারবে নিশ্চই —

কিন্তু একবার অনুমান করা যাক প্রানীরা যদি আধুনিক হত —

আচ্ছা যদি জিরাফ গলায় টাই বাঁধত তাহলে কত মিটার কাপড় প্রয়োজন হত, টাই পরে তাকে কেমন লাগত।

ধরা যাক যদি কেন্নোরা লেস দেওয়া বুট পরত তাহলে কত সংখ্যক বুট প্রয়োজন হত। সব বুট পরে তাকে কেমন লাগত।

যদি একটা beauty-contest আয়োজন করা হত এবং তাতে যদি রয়েল বেঙ্গল টাইগার অংশগ্রহণ করত তাহলে মুকুটটা কার মাথায় উঠত।

আচ্ছা বাবুই পাখি যদি বাড়ি তৈরির প্ল্যান estimate করত তাহলে সেই বাড়িটা কেমন হত। Best ইঞ্জিনিয়ারের prize টা সেই পেত।

আচ্ছা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় আলোক সজ্জার দায়িত্ব যদি জোনাকি পোকারা নিত তাহলে কেমন হত?

আচ্ছা ঐ যে ঐ পাখিগুলো যারা ঐ বড়ো শরীর নিয়ে নোংরা পরিষ্কার করত — ঐ যে শকুন ওরা কোথায়? বাঃ ওরা থাকলে নোংরা পরিষ্কারের কথা অন্য কাউকে বলা হত না। কিন্তু মানুষ এমন এক প্রানী যিনি ভাবেন তিনি নিজেই সব কাজ পারেন — যন্ত্র আবিষ্কার করেন ঐ কাজ গুলো করার জন্য।

মানুষের আধুনীকরনে প্রানী সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

মজাদার জুলোজি

সুরেখা চৌধুরী
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ফোর্থ সেমিস্টার)

কত সাধারণ জিনিস যা আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অথচ আমরা কোনোদিন সেভাবে নজরই দিইনি। এই ধরুন সাপের কথাই ধরা যাক... যদি প্রানীরাজ্যে চাকরির কোনো পরীক্ষা হত তাহলে সবার আগে সাপেদের চাকরিটাই পাকা হত, কারন ওদের মতো প্রতিবন্ধী সমগ্র প্রানীরাজ্যে আর কেউ নেই। আমরা সকলেই কমবেশি সাপকে দেখলে ভয় পাই কিন্তু কখনও ভাবিনি সাপের জীবনে বহুকিছুই নেই যার বলে আমার বলিয়ান...।

১) সাপের পা নেই

২) সাপের হাত নেই

৩) সাপের চোখ অস্বচ্ছ এক পর্দা দ্বারা আবৃত তাই সাপ সবকিছুই ঝাপসা দেখে বরং বলা ভালো সাপ চোখে ছানি নিয়েই জন্মায়।

৪) সাপ রং চিনতে অক্ষম

৫) সাপের অক্সিপিটাল কন্ডাইলটি খাঁজযুক্ত হবার কারনে সাপ ঘাড় ঘোরাতে অক্ষম তাই সাপকে দৃষ্টি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে হলে সমগ্র দেহটি ঘোরাতে হয়।

৬) স্থির কোনো বস্তু সাপের চোখে ধরা পড়ে না... focal length এর পার্থক্য ছাড়া সাপ দেখতে পায় না তাই স্থির জিনিস দেখার জন্য সাপকে বারবার ফনা নাড়াতে হয়।

৭) সাপের কান থাকে না তাই বাতাসে ভেসে থাকা কোনো শব্দ শুনতে পায় না।

৮) সাপের দেহটি সরু হওয়ায় ফুসফুসের আকৃতি লম্বাটে ধরনের তাই সাপের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এক্ষেত্রে বলা যায় সাপ হাঁপানি রোগী।

৯) ওরা নাকের সাহায্যে ঘ্রাণ নিতে পারেনা, ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য সাপকে তার চেরা জিহ্বার সাহায্য নিতে হয়।

১০) সাপ তার সমগ্র দেহ দৈর্ঘ্যের মাত্র ১/৩ অংশ মাটির উপরে তুলতে পারে তাই সাপের চেয়ে এক হাত দূরে থাকলে সে ছোবল মারতে পারে না।

খুঁজে দেখলে সাপের আরও প্রতিবন্ধকতা চোখে পড়বে... তাই সবার আগে সাপের চাকরি পাকা। আর রাজ্যটা যদি পশ্চিমবঙ্গ হয় তবে পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই হবে না।

।। প্রসঙ্গ হাই তোলা ।।

সাগ্নিক মন্ডল
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

ইথলজি বা Animal Behaviour-এর কথায় FAP (Fixed Action Pattern)। যা সকলের জন্মগত। যা কাউকেই শেখাতে হয় না।

প্রচীনকাল থেকে একথা আমরা বিশ্বাস করে আসছি যে হাই ওঠা মানেই ঘুমানোর সিগনাল দিচ্ছে শরীর। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, যখন আমরা হাই তুলি তখন মস্তিষ্ক একবার রিস্টার্ট করে নিয়ে নিজের সার্বিক প্রক্রিয়াকে। ফলে ব্রেনের কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হাই তোলার পর মস্তিষ্ক এতটাই কর্মক্ষম হয়ে যায় যে দ্বিগুন কাজ করার ক্ষমতা চলে আসে।

গবেষণায় দেখা গেছে,হাই তোলা বিষয়টা অতটা সহজ নয়। কারণ যখনই আমরা হাই তুলি তখন বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন আমাদের মুখগহ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ইয়ারড্রামসকে প্রসারিত করে। তারপর হাওয়াটা বেরিয়ে যায়।

কিছু কিছু সময় কাউকে হাই তুলতে দেখে আমাদেরও হাই ওঠে। তবে বেশিরভাগ সময়ই শরীর তার প্রয়োজন অনসারে বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে হাই তুললে আর কী কী উপকার হয় আসুন জেনে নিই ঃ

* খুব মন দিয়ে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে আমাদের হাই উঠতে শুরু করে। মন দিয়ে কাজ করলেও মস্তিষ্ক অল্পেতেই হাঁপিয়ে যায়। তখন সে কাজ ছেড়ে এদিক ওদিকের ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সেইসময় মস্তিষ্ককে পুনরায় মূল কাজে ফিরিয়ে আনতে শরীর একবার ব্রেনকে রিস্টার্ট করে। আর তখনই আমাদের হাই ওঠে।

* আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নতিতেও হাইয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাইএবার থেকে কাজ করতে গিয়ে যখনই ক্লান্ত লাগবে তখনই নিজের থেকে কয়েকবার হাই তোলার চেষ্টা করবেন। এমনটা করলেই দেখবেন মনোযোগ ফিরে আসবে।

* হাই ওঠার সময় আমাদের মুখের পেশিগুলি সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে থাকে। ফলে ব্রেনে রক্ত সরবরাহ বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।

* আপনার কম্পিউটার হ্যাং হয়ে গেলে নিশ্চয় রিস্টার্ট সুইচে চাপ দেন। তারপরই কম্পিউটার পুনরায় কাজ করা শুরু করে দেয়। একইরকম হাই ওঠার সময় আমাদের শরীরের সার্কাডিয়াম রিদম পুনরায় অ্যাকটিভেড হয়ে যায়।

* অনেক সময় কাউকে হাই তুলতে দেখলে পরক্ষণেই আমাদেরও হাই উঠতে শুরু করে দেয়। কাউকে হাই তুলতে দেখলেই আমাদের মস্তিষ্কে Mirror নিউরোন কাজ করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎআমার সামনের লোকটা যা করছে ঠিক হুবহু তাই করতে ইচ্ছা করে। সেই কারণেই তো একজনের হাই উঠলে সামনে থাকা বাকি সবাই একে একে হাই তুলতে শুরু করেন।

* বিজ্ঞান বলে হাই ওঠার সময় আমাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন লেভেল বেড়ে যায়। ফলে অক্সিটোসিন নামে এক ধরনের হরমোন ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে আমাদের মন-মেজাজ একেবারে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

কে তুমি

রাজু সর্দার
বি. এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আমি একাকি বসে আছি, নির্জন গার্ডেনে, হঠাৎ-ই দেখা তার। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকতে থাকি, কিন্তু কিছুতেই আমার কথা তার কান পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

তখন আমি হাত নাড়িয়ে ডাকতে থাকি, কিন্তু সে দেখতে পায়না। সোজা হেঁটে চলে গার্ডেনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। আমি পিছু পিছু যাই ওর সাথে। কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গ নিতে পারিনা, দৌড়ে ছুঁতে যাই তাও পারি না। তখন আমার ক্লান্ত শরীর বসে পড়ে এক গাছের তলে। আমি মাথা নিচু করে বসে আছি, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পাশে যেন কে বসে কানে কানে বলছে, ''কী ধরতে পারলে নাতো আমায়'' ?

তখন আমার হৃদয় সজাগ ভাবে দাঁড়িয়ে দেখল চারিপাশে কেউই নেই। তাহলে এতক্ষণ আমার পাশে কে কথা বলেছিল।

কিছুটা দূরে শুনতে শুনতে পাই 'নুপুরের' শব্দ, তাকিয়ে দেখি যেন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। তার পরণে ছিল নীল শাড়ি, আর হাতে ছিল রঙিন কাচের চুড়ি। কিন্তু মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। আমি এগিয়ে গেলাম তার সাথে কথা বলার জন্য। আমি তার কাছাকাছি যেতেই সে সরে যায়, একটু দূরে। তখন আমি দাঁড়িয়ে যাই এবং জিজ্ঞাসা করি 'কে তুমি' ? 'কী তোমার নাম' ? 'আর এই নির্জন গার্ডেনে কী করছো একা' ?

কিছুক্ষণ ও চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'সে যেই হই না কেন ? আর আমার নাম যেনে তোমার কাজ কী' ? আমি বললাম, 'না মানে তুমি অনেকক্ষণ আমার চারপাশে ঘুরছো, তুমি আমার পরিচিত' ? সে উত্তর দিল, 'তুমি আমায় চিনতে পারছোনা' ? আমার উদাস কণ্ঠ বলে উঠল, 'না..., তুমি মুখ ঢেকে আছো কীকরে চিনবো তোমায়' !

আর সে আস্তে আস্তে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসতে লগালো, তখনো আমি তাকে পুরোপুরি চিনতে পারিনি, কিন্তু চোখ গুলো দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন 'খুব চেনা', কাছের কেউ। তারপর সে আস্তে আস্তে মুখের আড়াল সরাতে লাগলো, এমন সময় জোরে একটা শব্দ কানে আসে, তাকিয়ে দেখি দরজা খোলার শব্দ, ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা বাজে।

চিত্র শিল্প চর্চার প্রয়োজনীয়তা

প্রীতি সাঁতরা
দর্শন বিভাগ, প্রথম বর্ষ

আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগ — ক্রমপর্যায়ে চিত্র অঙ্কনের ধারা অব্যাহত। আদিম যুগে মানুষ যখন কথা বলতে পারত না তখন তারা দেয়ালে পাথরের গায়ে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। প্রথমে পাথর ও অন্যান্য ধাতুতে আদিম মানুষ শিল্প কলা ফুটিয়ে তুলত। তৈরী করত নানা অলংকার। পরিবর্তিত যুগে পরিবর্তন ঘটেছে শিল্প সম্ভার। পাথরের গায়ে, বিভিন্ন পুঁথিতে মন্দির, মসজিদ, গির্জাতে খোদাই করে বা রঙের প্রলেপে শিল্পীরা সৃষ্টি করেছে কারুকার্যপূর্ণ নানা অমরকীর্তি। তৈরী করেছে নয়ননন্দন নানা সৌধ যা আজো মানুষের কাছে সমাদৃত। অনেক শিল্পী তাঁর অমর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে আজও বেঁচে আছেন। কোনারকের সূর্যমন্দির, তাজমহল এমত বহু শিল্প নিদর্শন আজও স্বমহিমার ভাস্বর।

শিল্পী — স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টি মানুষকে ভাবায়, রুচির ও মনের পরিবর্তন ঘটায়। সুস্থ সমাজ গঠনে অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে শিল্পীর গুরুত্ব অপরিহার্য। লেখনীর মাধ্যমে কবি, সাহিত্যিক যেমন সমাজ গঠনে শিল্পীর কাজ করে থাকেন, সমাজ জীবনে শিল্পীর দান অশেষ। ছবিই হচ্ছে শিল্পীর ভাষা। ছবির মধ্য দিয়েই শিল্পীর প্রতিবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে।

শিল্পের প্রতি আগ্রহ শুধু শিল্পীর নয় সমাজেরও বড় প্রাপ্য। ছোটবেলা থেকে শিল্পচর্চা ছোটদের শিল্পের প্রতি আকর্ষন বাড়ায়। চোখের সাথে সাথে মন ও ব্যাক্তিগত জীবনের রুচির পরিবর্তন বাড়ায়। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহশীল হয়। ছোটদের রঙের প্রতি আলাদা একটা আগ্রহ থাকে, ফলে বই এর পাতায় রঙ - বে - রঙ -এর ছবি দেখে তারা আকৃষ্ট হয়। ছবির মাধ্যমে তাদের বোঝাতে যেমন সুবিধা হয় তেমনি তাদেরও বুঝতে সুবিধা হয়। সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষনীয় সবকিছু স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ছবি দেখিয়ে না দেখা বস্তু সম্পর্কে একটা বিমূর্ত্ত ধ্যান ধারনা দেওয়া সহজ সাধ্য হয়। একথায় শিক্ষার প্রসার — বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, শরীরবিদ্যা, যে কোন বিষয়ই হোক না কেন ছবির গুরুত্ব ভাষা এক।

"চিত্র দর্শনে ও মানুষের মনকে সংস্কৃতি যুক্ত করে, উদার করে বিশ্বাত্মার সাথে মিলিত ভাবে ছন্দময় করে।"

কবিগুরু বলেছেন, "যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সে জাতি মহাপ্রান জাতি নয়।"...

আধুনিকতার আড়ালে

সুস্মিতা সাহু
গণিত বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

বিজ্ঞান আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ, যা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে অফুরন্ত শক্তির সম্ভবনা। কিন্তু ভাল দিকেও মন্দ দিক আছে, কারন—

'সর্বম অত্যন্তম্ গর্হিতম্।'

বিজ্ঞানের ভাল দিককে গ্রহন করতে গিয়ে তার অশুভ দিকটিকে আমরা ভুলে গিয়েছি।

সালটা ২০০৬, আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী বাজারে একটি টেলিফোন বুথের উদ্বোধন হল। সেই সময় এলাকার খুব উচ্চবিত্ত পরিবার ছাড়া টেলিফোন রাখার কোনো সুযোগ বা সামর্থ অন্যদের ছিল না। তাই নতুন তৈরী হওয়া ফোনবুথ ঘিরে উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সাল ২০১৬, বাজারে একটি সংস্থা 'জিও' লঞ্চ করল সীমাহীন ইন্টারনেট সার্ভিং ও ভয়েসকল এবং তাও সম্পূর্ণ ফ্রি তে। এমন লোভনীয় অফার প্রতিটি মোবাইল গ্রাহক গোগ্রাসে গিলল। "Digital India - এর জন্য এক অদ্ভূত পদক্ষেপ" বলে সকলে প্রশংসিত করলেন।

ঘটনা হল মাত্র ১০ — ১২ বছরের মধ্যে টেলি যোগাযোগ এত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তা এককথায় অকল্পনীয়। আমরা অজান্তেই এই দুনিয়ার একজন অংশীদার হয়ে পড়েছি। মুহূর্তেই তথ্য আদান-প্রদান, ই-মেল, সোসাল নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু!!!!! ....

হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এই অগ্রগতি বহুমুখী? না। একদমই নয়। সেলফোনের বাড়বাড়ন্ত আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হলেও, আমাদের জীবনে এর প্রভাব মোটেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্বস্তিদায়ক নয়। কতগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে সেই আশঙ্কা কতটা সত্যি তা পরিষ্কার হবে—

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মোবাইল থেকে যে অতি উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরন নির্গত হয় তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। গবেষনায় দেখা গেছে শিশু ও ২০ বছর কম বয়সীদের মস্তিষ্কের আবরণ তুলনামূলক পাতলা হওয়ায় ব্রেন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে ৫% বেশী।

যখন মোবাইল নেটওয়ার্ক অত্যন্ত দুর্বল থাকে সেই সময় কোনো কল রিসিভ করলে রেডিয়েশন বা বিকিরণের পরিমান সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক হয়। দেখা গেছে যত প্রযুক্তি অগ্রগতি লাভ করছে অর্থাৎ 2G থেকে 3G তারপর 4G তত এই বিকিরণ বা ক্ষতিকর রেডিয়েশনের পরিমানও ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে পরীক্ষামূলক ভাবে 5G চালু হতেই নেদারল্যান্ডসে কয়েকশো পাখির মৃত্যু হয়।

খুব ভালো করে পর্যবেক্ষন করে দেখা গেছে চড়ুই জাতীয় বিভিন্ন পাখি এই উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত বিকিরণ সহ্য করতে পারে না, ক্রমশই তারা অবলুপ্তির পথে। দেখা গেছে মোবাইল টাওয়ার থেকে ৩০০ - ৫০০ মিটার এই অঞ্চলে এই বিকিরণের পরিমান সবচেয়ে বিপজ্জনক। গবেষনায় দেখা গেছে কমবয়সী শিশুদের হাতে কারণে অকারণে মোবাইল তুলে দেওয়ার ফলে তাদের জিনের মিউটেশন ঘটছে, তা পরবর্তীকালে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ তৈরী করতে পারে। শুধু তাই নয়, রাতের বেলা ঘুমানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে 'মেলটনিন' নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে অনিদ্রা, মাথাব্যাথা এবং কাজে অনীহা প্রভৃতি অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আজকাল কিশোর কিশোরীরা Outdoor games ভুলে গিয়ে

Facebook, Whatsapp ও ইন্টারনেটে মশগুল। যা অত্যন্ত ভয়ানক। অত্যন্ত Social networking-এ আসক্ত হওয়ার ফলে বাড়ির লোকজনের সাথে আলাপচারিতা করতেও অনীহা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে, তা হল এক শিশুকে স্কুলে প্রশ্ন করল "তুমি বড়ো হয়ে কী হতে চাও" উত্তরে সে বলে, সে বড় হয়ে মোবাইল ফোন হতে চায় — কারন তার পিতামাতা তার তুলনায় মোবাইলের সাথে বেশী সময় কাটায় ও যত্ন নেয়। সে তার বাবা মায়ের কাছে অবহেলার পাত্র।

মানুষের মধ্যে একাকীত্ব বাড়ছে, সৃজনশীলতা, উদ্যম কমছে। সত্যিই! আমাদের ভাবনা চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে। তাই পৃথিবীর ৫০০ মিলিয়ন মানুষের কণ্ঠে ওঠে করুণ আর্তনাদ 'নব আবিষ্কার চাই না'। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন,—

"বিজ্ঞান যখন প্রেমের গান ভুলে ভাড়াটে জল্লাদের পোশাক গায়ে চাপায়, আর / রাজনীতির বাদশারা পয়সা দিয়ে তার ইজ্জত কিনে নেয়, / আর তার গলা থেকেও ধর্মের ষাঁড়েদের মতো কর্কশ / আদেশ শোনা যায় ঃ রাস্তা ছাড়ো। নইলে—।"

এখন না ভাবলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। আমাদের বুঝতে হবে আমাদের জীবন বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল নয়।

নারী শক্তি

বনশ্রী খাঁড়া
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

সত্যিই কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেছে? নাকি এই স্বাধীনতা শুধুই লোক দেখানো? আজও নারীদের জন্য এক একটা শব্দ ছলনা স্বরূপ। আজও নারী স্বাধীন হওয়ার ভাব দেখায়, কিন্তু নিজেই নিজের সীমা নির্ধারিত করে রেখেছে। যখন কোনো কিছু নিজের মতো করতে পারবে তখনই সে পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। সে নিজের স্বপ্নকে পূরণ করতেও পারে না, কাউকে কোনো কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেনা। সত্যি বলতে তার স্বপ্ন দেখা বারন। এখনও সময় আছে দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করার, যেদিন এই দেশের নারীরা পূর্ণ স্বাধীন হবে সেইদিন এক নতুন আলোর দিশা পাওয়া যাবে। যেইদিন সমস্ত নারী নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখবে ঐদিন দেশের দারিদ্র মুছে যাবে। যেদিন সমস্ত নাগরিক এটা বুঝতে পারবে যে, সমস্ত নারীদের পায়ে পা মিলিয়ে দেশ চালনা করা উচিত সেই দিন দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। সত্যিই কি ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে? নাকি এই স্বাধীনতা শুধুমাত্র লোক দেখানো?

'আমি, সে ও সখা'

রাজেশ মানিক
সমাজবিদ্যা বিভাগ

শুকতারার সৌখিন মুখ দেখে ঘুম ভাঙল। হাই তুলে বিছানায় বসলাম। আবছা আলোয় ঘেরা ছায়াময় প্রভাতে আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠল সবিতার মুখ। মনে পড়ল হ্যাঁ আজকেই তো বিকাশ আর সবিতার আসার কথা। সেই কবে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মনে নেই, তবে অমলিন সেই সখ্যতা তো ভুলবার নয়। বহু দিন পরে ওরা ফিরে আসছে ভেবে মনটা অদ্ভুতরকম খুশিতে নেচে উঠল।

মনে পড়ে সেই শালপিয়ালের বন, সেই হলুদ চম্পা চামেলীর বাগানে ফুল তোলা আর গল্প করা, ভালোলাগা আর ভালোবাসার গল্প। বড়ো অদ্ভুত রকমরে মিল ছিল তিনজনের, রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমরা কোনো এক অন্য ভাবনার জগতে চলে যেতাম। ফটিকের মাসিটার ওপর ভয়ানক রাগ হত। উটকো ঝামেলা বলে মনে করত ফটিককে। এটা আমাদের কারোরই ভাল লাগত না।

আজকের কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মিলিত হব তিনজন, ফিরে আসবে সেই ফেলে আসা দিন। গল্প গুজবের আড্ডায় ভরে উঠবে সময়টা। এই ভাবনায় মুগ্ধতায় ভরে উঠল মন।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে হুঁশ ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম রিনি পেছনে দাঁড়িয়ে। রিনি বলতে আমার ভাইঝি। ভারী মিষ্টি মেয়ে, একরত্তি মুখের আধো আধো কথা সমস্ত ঘরটা মাতিয়ে বেড়ায়। উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমুকে ভরিয়ে দিলাম তার মিষ্টি মুখটা। তারপর আর দেরি না করে চটপট বেরিয়ে পড়লাম ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। ওদের সঙ্গে ওইখানেই দেখা হবে। ওদের ফোন করে বাসের নম্বরটা জেনে নিয়েছিলাম। অপেক্ষমান মন যেন আর দেরী সইছে না। দেখলাম পরপর কতকগুলো বাস হর্ন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ স্টপেজের একটু আগেই দেখা গেল একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী হুড়মুড়িয়ে লোক-জনের ছুটোছুটি। আমিও কি যেন ভেবে লোকেদের অনুসরন করে ছুট লাগালাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কয়েকজনের মধ্যে খুঁজে পেলাম সবিতাকে। কিন্তু বিকাশ কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনা। এদিকে সবিতার জ্ঞান ফিরে এসেছে, বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। বিকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে। সকলের মধ্যে তো বিকাশ নেই।

তবে পুলিশ কি ভ্যানে বিকাশকে নিয়ে গেছে। গাড়ি করে হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বুকটা যেন অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছে, ঈশ্বরের নাম বার বার স্মরণ করতে করতে হসপিটালের দ্বারে গিয়ে বোবা হয়ে গেলাম দুজনে। সমানেই পড়ে রয়েছে দু-চারটে মৃত দেহের পাশে বিকাশের প্রানহীন নিথর দেহটা। জ্ঞান হারালো সবিতা।

কিছুই করার নেই অনিঃশেষ ব্যাথা বেদনার সিঁড়ি ভেঙে বাড়ি ফিরে এলাম আমি আর সে, শুধু এলনা সখাই।

নারী শক্তি

উপাসনা মান্না
ইংলিশ অনার্স, প্রথম বর্ষ

পৌরানিক উপাখ্যান অনুসারে শক্তি থেকেই নারীর সৃষ্টি, সেই অর্থে নারীর আর এক নাম শক্তি। যুগে-যুগে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে নানা রূপে, নানা ভাবে। কখনো মৈত্রেয়ী - গার্গী - অপালা - খনার বৌদ্ধিক মানসে, কখনো দূর্গাবতী - লক্ষ্মীবাই - রাজিয়া - মাতঙ্গিনীর প্রতিবাদ রূপে, কখনো পি. টি. উষা - মেরী কম - সাইনা - সানিয়ার ক্রীড়া কৌশলে, কখনো কল্পনা - বাচেন্দ্রী - অরুনিমা - কিরণের অদম্য মনোভাবে, আবার কখনো মাদার টেরেসা - আনন্দীবাই - নাইটেঙ্গেল - কাদম্বরী-দের সেবার হৃদয়ে। কিন্তু প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো সেই শক্তি স্বরূপা নারী আজ অবলা - অসহায় বলে পরিচিত। পন প্রথার যুপকাষ্ঠ - পাশবিকতার দেহসর্বস্ব লোলুপতা - পৌরুষ তান্ত্রিকতার ধৃতরাষ্ট্রতার চাপে পড়ে তাকে অনবরত করুনা - ভিক্ষা করতে হয় একটুকু প্রাণ ধারনের জন্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কোথাওবা প্রাণধারণের আগেই জন্মদাতার ষড়যন্ত্রে মাতৃ জঠোর থেকেই তাকে অকালে ঝরে যেতে হচ্ছে। কেন এই সন্ত্রস্ততা, কেন এই সীমাবদ্ধতা! যে সমাজের প্রত্যেককে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করায় এক নারী, যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে অমৃত সুধারস পান করিয়ে জীবনশক্তি দান করে এক নারী - সেই নারীর পরিচয় কেন আটকে থাকবে শুধুমাত্র পরনির্ভরশীল কন্যা - জায়া - জননীতে? সাড়ম্বরে দূর্গা আরাধনায় মগ্ন সমাজের ঘরের দূর্গারা কেন মুখ ঢাকবে অশিক্ষা - বলহীনতা - উপেক্ষার ওড়নায়? তাই প্রতিটি নারীকে করে তুলতে হবে শক্তিরূপা, স্কুলছুট কন্যাদের আবার শিক্ষার আঙিনায় ফিরিয়ে এনে, আত্মরক্ষার কৌশলে স্বাবলম্বী করে সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলের সচেতনতার প্রচার করে সবার মাঝে তার হারিয়ে যাওয়া স্থানটি অর্জনের যোগ্য করে নারীকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার অধিকার। সংরক্ষণের করুনা নয়, যোগ্যতার সম্মানেই তাকে করে তুলতে হবে উদ্ভাসিত । তবে অন্তর থেকে প্রতিটি নারী উচ্চারণ করতে পারবে—

"চাইনা করুনা, চাইনা অত্যাচার, চাইনাগো অতি ভক্তি,
আপন বলেই বলীয়ান আমি, — আমি নারী শক্তি।"

হারিয়ে ফেলা

ভানুমতী রায়
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
মহিষাদল রাজ কলেজ

ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
চলে চলে যাই পুকুরপাড়ে,
প্রজাপতির ডানার বাহার
লুকোচুরি পাতার আড়ে।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
ওই চেয়ে দেখ মেঘলা আকাশ
বিকেল হলেই খেলবি ক্রিকেট
দেখবো কেমন ছক্কা হাকাস।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
মাঝ পুকুরে সাঁতরে যাবি,
গোঁফ গজাবে, চোখ দুটো লাল
এক ডুবে মাটি খিমচে নিবি।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
শালুক পাতায় সই পাতাব,
কেয়ার বাড়ী ফের যদি যাস,
তেঁতুল মাখা একাই খাব।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
নিখুঁত করে দাগ কেটেছি
চু-কিত-কিত, বুড়ী-বাসন্তী
সবুজ ঘাসে পা রেখেছি।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
অনেক কথা, কেউ জানে না,
আকাশ মেঘে ছবি আঁকা
হারিয়ে গেছে, আর পাব না।
ছোট্টবেলা ছোট্টবেলা
মায়ের কোলটা ভীষণ খুঁজি,
বড় হওয়ার কী হয় জ্বালা
বড় হয়েই সেসব বুঝি।

কলম কথা

দীপেশ জানা
(বাংলা, তৃতীয় বর্ষ)

কবিতা আর লিখবো না
ভাবনা গুলো দেবো ফেলে
জাহ্নবীর জলে!!
কিন্তু জাহ্নবী আজ কোথায়?
শয়ে শয়ে কত জাহ্নবী আজ ব্যাথিত
লাঞ্ছিত সমাজ সাঁঝে,
আর আমি?
আমি তো শেকল বদ্ধ
এক কাপুরুষ
রয়েছি বঙ্গ মাঝে।

সমাজ

প্রশান্ত বেরা (তৃতীয় বর্ষ)

জীবনের অস্তিত্ব যখন মাঝ পথে থমকে দাঁড়ায়
আমরা তখন সমাজের উপহাস্য হই।
শিক্ষার গুমোট হতে আমরা যখন
সারা বিশ্বে শিক্ষাভবন খুঁজি
তখন আমরা বেকার
যুব সমাজ!!
ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ের যখন সত্তর ছুঁই
বুড়োর সাথে বিয়ে হয়,
ওটা নাকি সমাজের নিয়ম।
ধিক্কার সমাজ তোমায়
সত্যের চোখ দিয়ে আমরা যদি খাঁটি বাস্তব খুঁজি
তাহলে অসত্যের বেড়াজাল ডিঙিয়ে
সত্য সমাজ গড়ে উঠবেই।
কিন্তু আমরা পারিনা।
কাপুরুষ আমি।
পারিনা আমি ধর্মের ভেদাভেদ মুছে অধর্ম বিনাশ করতে,
পারিনা আমি নিয়মের গাঁথা পুঁথি গঙ্গায় তলিয়ে দিতে।
আমি পারিনা!
আমি পারিনা নতুন স্বপ্ন বুনতে।
শিক্ষিত বেকার আমি।

জীবনকে ভালোবাসো

অনামিকা ব্যানার্জী
ইংরাজী বিভাগ, প্রথম বর্ষ

কোনো কাজে ব্যর্থ হয়ে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ
ভেঙে পড়ে সেই কাজের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছ।
ব্যর্থ এই জীবনটাকে শেষ করেই দেবে—
সিদ্ধান্ত নিয়েছ হয়তো অনেক কিছুই ভেবে।
জীবন কী এতই মূল্যহীন, জীবন কী এতই তুচ্ছ?
সমস্যার মোকাবিলা না করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছ?
জীবনে আসবে অনেক সাফল্য, আসবে অনেক ব্যর্থতা,
আসবে সুখ, আসবে দুঃখ, আসবে অনেক বাধা।
জীবনের পথে যদি নামে আঁধার, যদি মনে আসে ভয়,
সঠিক পথ খুঁজে নিতে হবে, মনে না রেখে সংশয়।
সাহস ও আত্মবিশ্বাস আনতে হবে মনে
মুখোমুখি লড়তে হবে জীবনের সংগ্রামে।
সুখ, দুঃখ, আশা, স্বপ্ন — সবই জীবনের অঙ্গ
বেঁচে থেকেই বুঝতে হবে জীবনের মূল্য।
নতুন ভাবে জেগে উঠে জীবনকে করো উপভোগ
জীবন থেকে ছুটি নিয়ে হয়োনা তুমি নির্বোধ।
সুস্থভাবে বাঁচার জন্য জীবনকে ভালোবাসো
সাহসের সাথে, ন্যায়ের পথে জীবনটাকে গড়ে তোলো।
একদিন এই জীবন তোমায় ভরিয়ে দেবে সুখে,
দুঃখ-কষ্ট ভুলে তুমি বলবে হাসিমুখে—
জীবনের মতো কিছুই নেই এই পৃথিবীর বুকে।

ফেরারী মন

দীপেশ জানা
(বাংলা, তৃতীয় বর্ষ)

জীবনের সব চাওয়া আশা প্রত্যাশা
ক্ষনিকের ভালোবাসায় দিকভ্রষ্ট।
তোমার একতরফা প্রেমে,
আমার হৃদয় আজ ক্ষতিগ্রস্ত।
নিকোটিনের কালো ধোঁয়ায়,
জীবনটা আজ বিষাক্ত।
তাই, কিছু চাইনা আর
তোমার কাছে।
তোমার ভালোবাসার পূর্ণতা
জানি, পাবো না আর।
তোমার চলে যাওয়ায় জীবনে নেমেছে
অন্ধকার বারং বার।
তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম
তুমি ফিরে এলে না আর।

বন্ধু তোর জন্য

শুভজিৎ কুইল্যা
বি.এ. অনার্স (১ম সেমিস্টার)

বন্ধু নামে একলা পথে
বাড়িয়ে দেয়া হাত,
বন্ধু মানে থাকতো পাশেই হোক না যতই রাত,
বন্ধু মানে সকাল সন্ধ্যা তোর পছনেই লাগা,
মাঝে মাঝে তোর জামা না বলে নিয়েই ভাগা!
বন্ধু মানে সাত সমুদ্র তের নদী নয়।
বন্ধু মানে মনের দেশটা মনের দামে জয়।
বন্ধু মানে তোমার পাশে ছিলাম যেমন,
বন্ধু মানে আমার হৃদয়ে থাকবে হাজার জনম জনম।
বন্ধু মানে গল্প করবো তোর সাথে সারা রাত,
বন্ধু তুমি একা হলে আমায় দিও ডাক।
বন্ধু মানে সব কিছু খুলে বলা,
বন্ধু মানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

শীতের শোভা

মধুমিতা উত্থাসিনী
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

শঙ্খধ্বনি দিয়ে সবাই
ভোরের করে আগমন।
শিশির ভেজা ঘাসের উপর
ওই ছুটে যায় আলোর কোন।
নলেন গুড়ের গন্ধে ভরা
পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা।
লক্ষ্মী মায়ের পদভারে
ধানের গোলা ঢোলে পড়ে।
শীতের শোভা বজায় রেখে
শীতের শহর ঘুমিয়ে পড়ে।

পড়ার ছড়া

বিষ্ণুপ্রিয়া কুইল্যা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স, প্রথম বর্ষ

শ্রমের কোনো বিকল্প নাই
খাটতে হবে সব বিষয়
ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকো
তবেই শেষে আসবে জয়।।

খেলার ছলে পড়া ভালো
পড়ার ছলে খেলা নয়
মনদিয়ে পড়লে পড়া
খেলার মত সহজ হয়।।

সবকিছুতে বন্ধ চলে
খাওয়ার বেলা বন্ধ কই
তবে পড়াশুনা বন্ধ রেখে
কেন মোরা অন্ধ রই।।

ছবি আঁকার গোড়ার কথা
বলছি তোমায় শোন
রেখা টানার কৌশলটা
আগেই তুমি জেনো
ছবি আঁকার আনন্দটা
মনকে সতেজ রাখে
ভূগোল, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি আর
বাইলোজিতে লাগে।।

ইউনিয়ন

সুদীপ মান্না
বি. এ. অনার্স, প্রথম বর্ষ

তুমি প্রলয় নাকি বলয়
তুমি সৃষ্টি নাকি ধ্বংস
তুমি মরন নাকি বাঁচন
তুমি চিরন্তন নাকি নিরন্তর
তুমি শেষ নাকি শুরু
তুমি শ্রাবণ নাকি প্লাবন
তুমি শান্ত নাকি অশান্ত
ওগো প্রানের প্রভু রেখো বাঁচিয়ে
তোমার সৃষ্টির ফাগুন ধারা
নব বসন্তে আগমনে
এসেছি তোমার দ্বারে
দিও না সরায়ে
তব আলোকে হই যেন মোরা
মৃত্যুঞ্জয়ী অনলপারা
ঐক্যের তানে সকল প্রানে মনে
গ্রথিত মালা
বর্ষের পরে বর্ষ হোক শেষ
যেন না হয় তোমার লয় তোমার শেষ।

তুমি শুধুই তুমি

সুমঙ্গল মান্না
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

তোমার মনের হৃদয়ের মাঝে আমি
তুমি শুধুই তুমি।
নাহি থাকিবে কোনো বিবাদ
থাকিবে শুধু হিংসা আর খুনশুটি
আর থাকিবে রামধনুর মতো ভালোবাসা
তুমি শুধুই তুমি।
আসিতে দেবো না তোমার —
আমার মাঝে কোনো প্রবাল প্রাচীর
তুমি শুধুই তুমি।
তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা —
সারাজীবন অমর হয়ে থাকিবে —
আমার এই ছোট্ট প্রানময় কুটিরে
তুমি শুধুই তুমি।
আমার অন্তরের অনুভূতি যদি —
তুমি বুঝতে পারো তাহলে —
জানতে পারবে আমার —
ভালোবাসার জেদ কতখানি
তুমি শুধুই তুমি।
তোমার জীবনে আমার প্রতি —
কোনো জায়গা না ও যদি থাকে —
তবুও আমি তোমায় সারাজীবন —
ভালোবেসে যাবো
তুমি শুধুই তুমি।
আমার চক্ষু মাঝেতে থাকবে তুমি
আমার প্রিয়তমা, বন্ধু ও বান্ধবী
বিতিসা, শিখা, সীমা, দীপ্তি,
মদন, বিমল, সিদ্ধার্থ, রাজু প্রমুখ।
তোরা আমার জীবনে
সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবি।

স্মৃতি

অর্পিতা কুইলা
সোসিওলজি অনার্স, প্রথম বর্ষ

আমাদের ছোটো জীবন
হাসি-খুশিতে ঘেরা
হাসি-খুশির মাঝে সবার
স্মৃতি নিয়েই ফেরা।
কান্না হাসির মাঝে আমরা
স্মৃতি যে পাই কত
স্মৃতির মাঝে থাকে আমাদের
সুখ দুঃখ শত।
দিন ক্ষন সময় যায় যে চলে
স্মৃতি যে যায় রয়ে
মনের মাঝে কত কথা
চলে দুকুল বয়ে।

মা

শিউলি সাউ
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

বাড়িতে সবাই আছে,
মা নেই মানে শূন্য।
খোলা আকাশ মা আছে,
পাশে সবই লাগে পূণ্য।।
প্রথম যখন হাঁটতে শিখি,
মায়ের আঙুল ধরি।
মায়ের হাতটি ধরে আমরা,
জীবনটাকে গড়ি।।
ছোট্ট বেলায় ঘুমের ঘোরে,
মায়ের আঁচল চেপে ধরি।
ঘুম পাড়ানির কত গানে,
মা আনত ডেকে ঘুমের পরি।।
মায়ের স্নেহের কত ঋণ,
বাড়িয়ে দেয় মা দিন দিন।
সেসব সত্যি কোনোদিন,
যাবে না তো ভোলা।
মা ছাড়া জীবন হবে,
মরুভূমিতে পথ চলা।।

শীতকাল

মৌসুমী জানা
বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

শীতের দিনের ভোরের বেলা
শিশির ভেজা ঘাসে,
দূর্বা ঘাসের ফুলগুলি
মুখটি তুলে হাসে।
গাছের ওপর দুটি পাখি
একটি ডালে বসে,
মধুর সুরে গান ধরেছে
আপন মনের বেশে।
তাদের গানের সুরে যেন
বাদল ছুটে আসে,
ঢেউ খেলিয়ে নাচের তালে
শুকনো পাতা ভাসে।
রঙিন রঙিন প্রজাপতি
উড়ছে যে মন খুলে,
পাখিরা তখন সুর তুলেছে
মিষ্টি গানের তালে।
মনের মতো মেতেছে ওরা,
আজ আনন্দের জলসায়,
তখন তারা রয়েছে যেন
এক সুখের নিরালায়

শোকাহত

স্বস্তিকা মন্ডল
ভূগোল, প্রথম বর্ষ

যখন যেখানে চাই
নয়ন সম্মুখে দেখি তুমি নাই।
হৃদয় এর মাঝখানে
নিয়েছো যে ঠাঁই।
তাই তো খুঁজে যাই
এই দুনিয়ায়...
শুধু তোমায়... শুধু তোমায়
তুমি ছিলে বন্ধু আমার
সুখ দুঃখের সাথী
যাকেই যদি একলা চলে,
তবে করলে কেনো সাথী
ভাইটি আমার দুঃখ নিয়ে
গেলে যেই না চলে,
ফিরল না তো আর
এই পৃথিবীর কোলে...
সব মায়া ভুলে আজ
গেলো পরমানন্দে,
হৃদয় খানি দিলে শুন্য করে।
হাসি খুশি ছিলাই তো বেস,
আমাদের দুনিয়া
তবে কেনে ঘনিয়ে এলো
কালবৈশাখীর মেলা
নেবেই যদি হে ভগবান
দিলেই কেনো তবে ?

আমি দরিদ্র

দেবাশিষ আচার্য্য
রসায়ন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

হ্যাঁ আমি দরিদ্র
তাই বলে আমার পকেটে নেইকো টাকার ঝুড়ি।
আমার দিন কেটে যায় খেয়ে দশ টাকার
একটা মশলা মুড়ি।
হয়তো আমার পরনে নাইকো ভালো পোষাক
হয়তো আমার মধ্যে নেই আধুনিকতা,
তবুও দেশের অবস্থা দেখে আমি নির্বাক
আমার হারিয়ে যায় চিত্ত।
হ্যাঁ
আমি দরিদ্র
কিন্তু আমারও ইচ্ছে হয়
বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিই
আর খাই গরম কফি
কিন্তু উপায় নেই পকেট তো আমার ফাঁকা।
মাঝে মাঝে ফুটপাতের ক্ষুধার্তদের
রুটি খাওয়ানোর ইচ্ছেও আছে।
কিন্তু কি করব এ কথা ভেবে
আমার দারিদ্র আমায় নিয়ে হাসে।
হ্যাঁ
আমি দরিদ্র
কিন্তু আমি সভ্য সমাজের
মুখোস পরা অভদ্র নই
তাই আমি থাকতে চাই
গেঁয়ো আর বন্য।

স্বপ্ন

মুস্রিয়া পতি
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

স্বপ্ন তুমি হারিয়ে গেছো
নিঝুম রাতে, তারার মাঝে
আজও আমার এলেনা কাছে।
তোমার আশায় থেকে থেকে
রাত যে আমার কাটিল শেষে।
ভোরের আলোয় হাজির হও
আমার মনের ভেতর দিয়ে।
জীবন আমার এমনি গেল
তোমার কথা ভেবে ভেবে।
আজও তুমি এলেনা কাছে
ঘুম জোড়ানো দুই চোখেতে
স্বপ্ন তুমি আশার আলো
ছোট হলেও তাও তো ভালো
স্বপ্ন নিয়ে জীবন বাঁচা
রাতের শেষে সকাল বেলা
স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলা।।

সুখ ও দুঃখ

বর্ণালী মড়া
সোসিওলজি অনার্স, প্রথম বর্ষ

জীবন মানে এই নয় যে,
শুধুই সুখ কিংবা দুঃখ।
সুখের মাঝে দুঃখ যে আছে,
দুঃখের মাঝে সুখ।
তুমি যদি বল শুধুই চাই সুখ,
দুঃখ না এলে বুঝবে কী করে
এটাই হল সুখ।
তা ব'লে ভেবোনা যে,
কাউকে দুঃখ দিয়ে তুমিই হবে সুখী।
শুধু দুঃখ দেয় যারা,
তারাই হয় দুঃখী।
আবার কেউ নিজের দুঃখ দেখেও তবু,
অন্যের সুখে হয় সুখী।
তার মতো কয়জনা হয়,
এরকম সুখী।।

মেঘ

শিউলি ধাওয়া
বাংলা অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

মেঘ মানেনা কাঁটা তারের বেড়া,
ইচ্ছেমতো তাই স্বপ্ন বোনে তারা।
চলছে উড়ে নিজের খেয়াল মতো,
দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভেদ করে আজ যত।
ছন্দে এঁকে শত মেঘচ্ছবি;
মুক্ত চিত্তে নেত্র মেল যদি।
রবীন্দ্রনাথ, পক্ষীরাজের ঘোড়া,
তন্বী তারা সাদা তুলোয় মোড়া।
আঁকাবাঁকা তুলোর মাঝে তাঁরা,
উড়ে চলে বিশ্ব-ভুবন-পাড়া।
তাইতো ভাবি, হতাম যদি মেঘ,
যেতাম ভুলে সকল দ্বন্দ্ব-ভেদ।।

ঋতুপুষ্প

রিয়া চক্রবর্ত্তী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স, প্রথম বর্ষ

গ্রীষ্মকালে বেলা ফুল
গন্ধ তার মিষ্টি,
বর্ষাকালে কদম ফুল
প্রকৃতির সৃষ্টি,
শরৎকালে কাশ ফুল
সাদা রঙটি তার
হেমন্তের পলাশ ফুল
আগুন বর্ণ যার,
শীতকালে ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা
ফুলের মেলা
বসন্তের ফুলের বাহার
কোকিলের খেলা।

রাজ কলেজ

সম্পা সিংহ
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ

নাই কো দুঃখ নাই কো ব্যাথা,
জীবনের মাঝে।।
তৃণমুল ছাত্রসংসদ সাথে আছে
ভয় কী আমার সাজে?
শিক্ষালাভের জন্য আমরা
এই কলেজে আসি।।
কলেজকে তাইতো মোরা
এতোই ভালোবাসি।।
অনুষ্ঠানকে রঙে সাজাই
নিয়ম শৃঙ্খলা মানবো।।
জানার মাঝে অজানাকেই
নতুন করে জানবো।।

মনে পড়ার দিন

শিখা হাইৎ
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

চক্, ডাস্টার, টেবিল, চেয়ার সবই তো একই আছে।
নেই শুধু আমরা,
কিন্তু আমাদের স্মৃতি গুলো জড়িয়ে আছে।
মনে হয় সেই ফেলে আসা দিন।
ছিলাম একসাথে হত না কারো মতের অমিল,
সেই ফুচকা খাওয়া, আইসক্রীম খাওয়া।
ভুলতে পারি না এখোনো।
খুঁজে বেড়াই সেই দিন।
পাই নাকো তার দেখা।
আজও মনে পড়ে সেইদিন।
কতো স্মৃতিই না আমরা পার হয়ে এসেছি।
সবাই কতো আনন্দই না করেছি,
আজও মনে পড়ে সেই দিন।
মনে পড়ে যায় স্যারদের বকুনি,
মনে পড়ে যায় স্যারদের স্নেহ, মমতা,
আজও মনে পড়ে সেই দিন।

এই আমাদের দেশ

দীপা ভৌমিক
সমাজবিদ্যা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

থাকি সবাই মিলেমিশে,
এই সমাজের মাঝে।
নিয়ে সব সংস্কৃতি,
থাকি ভারতবর্ষে।
হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—
থাকে সবাই ভালোবেসে,
নেই কোনো ভেদাভেদ,
আমাদের এই দেশে।
জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে—
থাকি সবাই আনন্দে,
একে অপরের হাত ধ'রে
থাকি এক বন্ধনে।
এই আমাদের দেশের কথা,
দেশটা আমাদের।।

বন্ধু

সঞ্চিতা পাত্র
সোসিওলজি অনার্স, প্রথম বর্ষ

বন্ধু মানে সকালবেলা
বন্ধু মানে সাঁঝ,
বন্ধু মানে মনের কথা
বলতে কিসের লাজ।
বন্ধু মানে ফাঁকা মাঠে
একটুখানি হাওয়া,
বন্ধু মানে এই জীবনে
অনেকখানি পাওয়া।
বন্ধু মানে সন্ধ্যার শীত
একটু কেঁপে ওঠা
বন্ধু মানে ভোরের আলোর
নতুন গোলাপ ফোটা।
বন্ধু মানে অভিমান আর
কথা কাটাকাটি
মাঝে মাঝে মিস্‌কল
আর আড্ডা ফাটাফাটি।

শুধু তোমারই জন্য

অনন্যা ভৌমিক
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

আমি নীল আকাশের বুকে তোমার জন্যে
একবার ডানা মেলে উড়তে চাই,
জ্যোৎস্না রাতের রূপোর চাঁদটিকে
তোমায় উপহার দিতে চাই।
আমি নোনা জলে সিক্ত ঠোঁটে
এক চিলতে হাসি চাই,
সমুদ্র তীরে গোধূলী লগ্নে
নগ্ন পায়ে হাঁটতে চাই।
আমি পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে
চিৎকার করে বলতে চাই—
ভালোবাসি! ভালোবাসি!
অনেক বেশী ভালোবাসি তোমায়,
আরো অনেক বেশী ভালোবাসতে চাই
শুধু তোমাকে!
শুধু তোমার জন্যে আমি
আরও একবার হাসতে চাই,
আরও একবার প্রাণ খুলে বাঁচতে চাই।
শুধু তোমারই জন্য!

জীবন

মহুয়া ভৌমিক
বি. এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স

শুনেছিলাম মানব জীবন দুঃখ হাসির ছন্দ,
ভাবিনি কোনো দিন, আমি হবো সাবালক।
বয়সটা আমার অনুমানে উনিশ কিংবা কুড়ি,
মাঝে মধ্যে মনে হয় খুবই বাহাদুরি।
কখনও বা ভেবে বসি খুবই আমার বহর,
জানতাম না আমার জীবন বাক্সে বাঁধা মোহর।
ভোররাতে উঠে দেখি কুয়াশার মাঝে,
আমার জীবন অনেকখানি খেলার ছলে ভাসে।
এখন শুধু আমার মাথায় টাকায় আঁকা ফন্দি,
মাঝে মধ্যে বাঁধে আমায় পড়াশোনার-গন্ডি।
চেয়েছিল বাবা আমায় পড়াতে ডাক্তারি,
লোকে বলে আমার জীবন দ্বন্দ্ব ভেদে আড়ি।
কখনও বা কথা বলি বেশ রাজার মতো,
ভাবিনা যে কথায় আমার অসঙ্গতি কতো।
মাঝেমধ্যে ভাবি আমি এ জীবনটা বৃথা,
শুধু ভাবি মনের মানুষ বলবে আমার কথা।
তাইতো বলি আমার জীবন আমার-ই তো হোক,
সবেমাত্র হলাম আমি এইতো সাবালক।।

গোড়ার কথা

মৌসুমী ভুঞ্যা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স, প্রথম বর্ষ

পড়াশুনা বুঝে শেখা,
ছন্দ দিয়ে মনে রাখা।
মুখে বলে তবে লেখা,
দিনে দিনে এগিয়ে থাকা''।।

''পরীক্ষাটা এসে গেছে,
পড়তে হবে বারবার।
রিভিশানে জোর দিলে,
রেজাল্ট হবে চমৎকার।''

''ধাপে ধাপে করবে অঙ্ক,
ছোট থেকে বড়।
অনুশীলন করবে যত
ততই হবে দড়''।।

''আছে অনেক গোড়ার কথা,
বলবো কিছু আজ।
কাছে এসে বসে শোন,
করো না ভয় লাজ''।।

মনের পাখি

সেক্ আসপাক আহমেদ
বি. এ. অনার্স

আয়না কাছে আয়না পাখি
মনের কথা কই
ঘরের কোনে একলা আছি
শান্তি পাচ্ছি কই।
কেউ জানে না কেউ বোঝে না
কাটছে ব্যথার দিন
দিনগুলো যায় চোখের জলে
কূল নিশানাহীন
যেদিকে চাই মরুভূমি
পাইনা গাছের ছায়া
আজ মনে হয় ভালোবাসার
নেইতো কোন কায়া
আয়না পাখি আজকে তোকে
সঙ্গী করে রাখি।
দুজনে মিলে ভালোবসার
ছোট্ট স্বপ্ন আঁকি।

অরন্য

বর্ণালী সাহু
বি. এ. প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত অনার্স

অরন্য তুমি মানুষকে করেছো দান
নগন্য বলিয়া তারাই করে অপমান।
রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে মানুষের তরে
দাঁড়াইয়া রয়েছো আকাশের প'রে।
পাখিরা তোমার শাখায় বাসা করে
এক ঝাঁক বক ফিরে যায় ঘরে।
তোমার কাঠেই হয় ঘর, বাড়ি, বাসা
সবুজে সবুজে ভরা অরণ্য ঠাসা।
এক অঙ্কুর থেকে বড় হও তুমি
নীচের মাটিতে সবুজের ভূমি।
অরন্য মিলায়ে তাল
সুর ধরি ক্ষনকাল।
অরন্য তুমি প্রকৃতির দান
সাজায়ে রেখো এই সুন্দর বান।।

রূপকথার দেশ

পায়েল বেরা
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

রূপকথারই দেশে,
নিয়ে যাবে ভালোবেসে।
রাজারকুমার এসে,
বলবে আমায় হেসে।
সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে
এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে,
শুধু তোমায় ভালোবেসে।
যাবে কী আমার সাথী হয়ে?
থাকবে আমার সাথে,
সেই রূপকথারই দেশে।

বৃষ্টি

সুদীপা বারিক
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

সেজেছে মেঘ রঙিন সাজে
আরো সজ্জিত হয়ে উঠল নতুন সাজে
আরো গাঢ়ো কালো মেঘ সজ্জিত হল।
তারপর কালো মেঘে ম্লান আলোয় ভরে দিল পৃথিবী
তারপর কালো মেঘ থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়তে থাকে
তখন প্রকৃতির গাছেরা গুন গুন করে
গাইতে থাকে আপন প্রানে
আয়রে বৃষ্টি আয়।
আমার প্রান জুড়াবি আয়
তুই তো আমার প্রান।
তুই তো আমার সব,
তোকে না দেখিতে পাইলে
আমার প্রান কেমনে করে জুড়ায়।
তাইতো আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি
মাটির উপর দাঁড়িয়ে।
শুধু তোমার গর্জন কখন হবে
আর সারা পৃথিবী আলোয় আলোকিত করবে।
তারপর আস্তে আস্তে আমার ডালপালায় মুশল ধারায় বৃষ্টি পড়বে
আর আমার প্রানটি জুড়াবে।

হৃদয় চারিনী

সুশমা মাইতি
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

তুমি হৃদয় চারিনী, হৃদয়ে ফোটা ফুল,
তুমি প্রেমের প্রদীপ আমার, তাতো নয় ভুল।
সাগর তুমি, নদী তুমি, তুমি প্রেমের আশা,
শুকনো জীবন, জীর্ন জীবনে তুমি ভালোবাসা।
আসলে তুমি শ্রাবন হয়ে, বৃষ্টি ঘন দিনে,
থাকতাম আমি দুঃখ নিয়ে ভালোবাসার দিনে।
গোলাপ তুমি, পাপড়ি তুমি, মিষ্টি করে হাসো,
জানি আমি ওগো বধূতুমি আমায় ভালোবাসো।
মনমন্দিরে তুমি আমার প্রেমের দেবী তুল্য,
কী করে দেব আমি তোমার ভালোবাসার মূল্য।

ঋতুর ধারা

কুহেলী সাউ
বি. এ. প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত অনার্স

"গ্রীষ্মকালে" দিন দুপুরে,
সবাই তখন ঘরে ফেরে।
"বর্ষাকালে" বৃষ্টি পড়ে,
কোকিল তখন ভয়ে মরে।
"শরৎকালে" মা-র আগমনে,
চারিদিকেই খুশী।
"হেমন্তে" সোনালী ক্ষেতে,
পাখিরা ভিনদেশী।
"শীতকালেতে" ঠান্ডা আভায়,
প্রকৃতি সেজে ওঠে
"বসন্তকালে" কোকিলের সুরে,
হৃদয় সুখে ছোটে।।

কবিতা বাড়ি

কবিতা থাকে শীতের ভোরে গরম কফির কাপে,
কবিতা থাকে ঝিম্ ঝিম্ বর্ষায় সন্ধ্যে নামে মাঠে।
কবিতা থাকে বোশেখ মাস কালবোশেখীর ঝড়ে,
কবিতা থাকে কাটফাটা রোদে সোনালী ধানের খড়ে
কবিতা থাকে শিশুর ঠোঁটে, পাখির কলরবে,
কবিতা থাকে শিশু আনন্দে বৈভবে।
কবিতা থাকে দুচোখ জুড়ে অষ্টাদশীর চোখে,
কবিতা থাকে শব্দে শব্দে 'ভালোবাসিই তোকে'।
কবিতা থাকে রেলস্টেশানে পার্কে নরম ঘাসে,
কবিতা থাকে হলদী নদীর তীর প্রদীপ যেথায় হাসে।
কবিতা থাকে ড্রয়িংরুমে প্রতিবাদের ভাষায়,
কবিতা থাকে জীবন জুড়ে, এবং ভালোবাসায়।

হয়তো তোমারি জন্য

পৌষালী সামন্ত
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

আশায় আশায় পুড়ছে জীবন
মনে পড়ে – সেই শীতের দিনযাপন ?
থাকতাম আমি দাঁড়িয়ে
শুধু দেখবো বলে তোমারে।
যেদিন তোমার পেলাম দেখা
মনে হল অন্ধকারে একটু আলোর দিশা
যেদিন তোমায় দিলাম প্রস্তাব
তুমি মুচকি হেসে বললে, একটু দাও অবকাশ
তোমায় খুঁজতাম সারাবেলা
মনযে আমায় পাগল পারা
অবকাশ দাও বলে,
তুমি গেলে কোথায় চলে ?
চোখের কোনে আসত জল
মন সাগর আমার ছল ছল।
অপেক্ষায় থেকে হল মন যে আমার ক্ষুন্ন
কী জানি ? হয়তো তোমারি জন্য।।

ঘুম

কৃষ্ণকলি বর্মন
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

সারাটা দিন পথ চেয়ে থাকি
কখন আসবে তুমি,
হাতের পরশে ঊষার ছোঁয়ায়
হারিয়ে যে যাই আমি।

ক্লান্তি দূরে স্বপ্ন নিয়ে
যাই যেন এক দেশে,
মিথ্যে ভাবনা সত্যি হয়ে
আসে যে মনে ভেসে।

সারাটা রাত আগলে রাখো
ছাড়ো না তুমি আমায়,
সবকিছু আমি দেখতে পাই
শুধু দেখিনা তোমায়।

মিথ্যে স্বপ্ন দূর হয়ে যায়
খুললে আমার আঁখি,
তখন ভাবি কেন যে তুমি
দিলে আমারে ফাঁকি।

আসলে তুমি রাতের সাথী
তারার মতো নিঝুম
তাইতো তোমার নাম হয়েছে
মায়াবি চোখের ঘুম।।

স্বপ্ন

সুরজিৎ নায়েক
বি. এ. জেনারেল, দ্বিতীয় বর্ষ

'স্বপ্ন' তো হয় সকলের
পূরণ হয় কয়জনের ?
জীবনের এই যাঁতা কলে
পেশা হয় সকলে
খেলতে এসে এই ভুবনে
মোরা কতকিছুই দেখি
সব কিছুই ফের ভুলে যাই
মনে কি কেউ রাখি ?
ভেবেছিলাম সারা জীবন
কাটবে ভারি সুখে
তা হল না এ.জীবনে
তাইতো লিখি দুঃখে
জানি আমি, সব লাল পাথরই
পান্না চুনী হয় না
ইচ্ছে পূরণ হয় না জানি
তবু আমি বলছি শোনো
'স্বপ্ন' তোমরা দেখো অনেক
দোষ নেইতো কোনো।
সামলে রেখো ইচ্ছেটুকু
সব থেকে বড়ো কথা
বলছি তোমায় শোনো,
'স্বপ্ন' ছাড়া এ ভুবন
'অন্ধকার' জেনো।।
সামলে রেখো ইচ্ছেটুকু
বাঁচার মতো বাঁচো
সৃষ্টি সুখে দিনে রাতে
কান্না হাসি নাচো।

আমার ভাবনা

সঞ্চিতা জানা
সংস্কৃত, প্রথম বর্ষ

সামনে আমার খাতা খোলা
পেনটা আমার হাতে।
সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে
জাগছি আমি রাতে।
কালি কলম নিয়ে মনে
লিখবো ভাবি কিছু,
ভেবে ভেবে রাত কেটে যায়
মাথা হয় নীচু।।
বাঁ হাত গালে - ডান হাত পেনে
আবার ভাবি আমি,
বাবা উঠে বলেন রেগে
করছিস কী পাগলামি।
রাত-দুপুরে করিস কী যে,
ঘুম আসছে না চোখে।
আমি বলি লিখবো কিছু
পড়বে সকল লোকে।।
বাবা বলেন পড়ার সময়ে
রোজই পায় ঘুম,
এখন শুধু ঘুম তাড়িয়ে
পদ্য লেখার ধুম ?

ভালোবাসি

সুমন ভুঁইয়া
বি. এ. জেনারেল

আমি স্বপ্ন ভালোবাসি
কিন্তু বাস্তব কে নয়
আমি সাজাতে ভালোবাসি
কিন্তু সাজতে নয়।
আমি জীবনকে ভালোবাসি
মরনকে নয়।
আমি ফুলকে ভালোবাসি
ভুলকে নয়।
আমি নাচতে ভালোবাসি
নাচাতে নয়।
আমি ভালোবাসাকে ভলোবাসি
প্রেমকে নয়।
আমি দেখতে ভালোবাসি
দেখাতে নয়।
আমি শুনতে ভালোবাসি
বলতে নয়।
আমি তোমাকে ভালোবাসি
কিন্তু নিজেকে নয়।
এখানে ভালোবাসা হল ঈশ্বর
আর অন্যসব হল চেতনা।

বন্ধুত্ব

প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক
সংস্কৃত অনার্স

মনে পড়ে ফেলে আসা বন্ধুত্বের ক্লাসরুম
খুনসুটি আর বন্ধুত্বে আনন্দ মরশুম
চেয়ার, টেবিল, স্যারের কথা বলার কি আর আছে,
সবই আমার অতীত কথা একঘেয়ে তার কাছে
গল্প - আড্ডায় যাচ্ছিল দিন আমাদের ইস্কুলে,
হারিয়ে গেছে বন্ধুত্ব আজ সবাইকে ভুলে।
বন্ধুত্ব খুঁজে বেড়াই ভিড়েই মিশে আছে
সেই বন্ধুত্ব আসবে না আর আমার মনের কাছে।

সাধ

শুভজিৎ পাত্র
ফিলোজফি অনার্স, প্রথম বর্ষ

মনে ছিলো সাধ, দার্জিলিং যাব বেড়াতে—
পারলাম না, মা বাবাকে এড়াতে,
বেরিয়ে পড়লাম এক সাথে।
মনে ছিলো সাধ, দার্জিলিং যাব বেড়াতে।
আনন্দে হলাম পাগল, শিলিগুড়ি পেরোতে
স্বপ্ন দেখছি না তো রাতে!
মনেছিলো সাধ, দার্জিলিং যাব বেড়াতে
ঘুম ইস্টিশনে নেমে, লাগল সবাই ঝিমোতে,
কাঁপছে শুধু শীতে
মনে ছিলো সাধ, দার্জিলিং যাব বেড়াতে।
মিরিকে দেখি, পাইন ছুটছে আকাশ ছুঁতে
হাসছে তারা দিনে রাতে,
মনে ছিলো সাধ, দার্জিলিং যাব বেড়তে—
রাত জেগে তাই বসে থাকি, টাইগার হিল
পাব তো তোকে দেখতে??

হঠাৎ সেই দেখা

লাবনী দোলুই
বাংলা অনার্স

হঠাৎ করে দুজনের দেখা হবে,
কোনোদিন তা ভাবিনি।
তোমায় নিয়ে তো আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছি,
বাস্তবে পাওয়ার আসা করিনি।
কারণ কষ্ট হলেও এটাই বাস্তব।
পাওয়ার আশা করেলেই হারাতে হয়।
যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল দুজনের,
সেদিনই ভেবেছিলাম—
একটা গোলাপ তোমার হাতে দিয়ে বলবো,
আমি তোমাকে ভালোবাসি—
আরও অনেক কিছু বলতাম,
কি কি বলতাম জানো—
"তোমার ওই মায়াবিনী চোখ," "সুহাসিনী ঠোঁট"
করেছে আমায় পাগল—
এমনকি প্রতি রাতের স্বপ্নে আমি শুধু,
তোমার ওই অসামান্যা নাচের মধ্যে আমি ডুবেছি।
কিন্তু, তুমি আমায় বুঝলেনা কোনোদিন।
হ্যাঁ, আমি এটাও জানি,
তুমি আমাকে একদিন ঠিকই বুঝবে।
কোনো অসুখী ভুল মনে।
কিন্তু, সেদিন আমি আর এই পৃথিবীতে থাকবো না।
হয়তো বা! হয়তো বা! হয়তো বা!

শীতের সকাল

চুনকি মুর্মু
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

দুষ্টু হাওয়া বয়ে গেল উত্তর দিক হতে
সকালবেলা শিশির ভেজা দুরন্ত শীতে,
দুরন্ত সেই লেপের মুড়ি - গরম চাদর কাপে
সূর্যি মামা আসরে কখন ভরিয়ে দিতে তাপে
শীতের দিনে খাওয়া মানে রোজই ভুরিভোজ
পিকনিকের ভাবনাতে এদিক - ওদিক খোঁজ।
পিঠেপুলি খেজুর গুড়ের তুলনা নাই ভাই,
মেলের দিন ফিরে আসবে ভাবতে থাকি তাই
পরিযায়ী পাখিদল আসবে আবার ফিরে—
শীতের সকাল চলে এলো তোমার আমার ঘিরে।

আবেগপুঞ্জ

শুক্লা হাজরা
সংস্কৃত অনার্স, প্রথম বর্ষ

একটা অভিমানী কবিতা শোনাবে?
যেখানে মৃত ছন্দেরাও বেঁচে উঠবে একটু করে
আবেগের ছোঁয়ায়?
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে,
একলা হেঁটে কখনো ওই নিস্তেজ লোকের ধার দিয়ে
বৃষ্টির বিরক্তি দিনের কথা ভুলে বারান্দায় আবার
ভিজে
দেখো ওই কাকভেজা চোখ নিয়ে।।
বলে দিও ওই আড়ালী মেঘকে
মিথ্যা আবেগ না দেখিয়ে
অটবীতে রোদন নামিয়ে,
যেন ভিজিয়ে দেয় তোমার কাঠশুষ্ক ঠোঁট
উদ্দাম প্রেমের সাথে মিলনের বিনুনি বেঁধো
তোমার মেঘ কেশের খোঁপায়,
দেহের অশান্ত আবেগ ঝরে পড়লে,
রেখো মোরে লুকিয়ে থাকা বেদনায়।।

আমাদের ম্যাগাজিন

মধুশ্রী জানা
সমাজবিদ্যা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

শুনে বড় খুশি হই
বের হবে ম্যাগাজিন
কী লেখা দেব আমি
ভেবে মরি সারাদিন।
অনেক ভাবনার পর
পেলাম এক রাস্তা
দিদিকেই ধরলাম
লিখে দিতে কবিতা।
বিনিময়ে উপদেশ
নিজে কর চেষ্টা।
সেই ভালো নিজে লিখি
মেলেনি যে শেষটা।
নেই আশা ভরসা
তবে কী বা এসে যায়?
জমা দিই কাঁপা হাতে বহু ভয় ভাবনায়।
নামহীন লেখা নিয়ে
কত ভাবি রাতদিন
অবশেষে নাম দিই
আমাদের ম্যাগাজিন।

কলেজ

সমীর কুমার দাস
ইতিহাস অনার্স, প্রথম বর্ষ

কলেজ মানে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া,
কলেজ মানে জীবনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।
কলেজ মানে হাজার জনের একজন হওয়া,
কলেজ মানে ছাত্র সংসদে প্রবেশ করা।
কলেজ মানে ছাত্র সংসদের কাজে সাহায্য করা,
কলেজ মানে প্রথম দিনের নতুন বন্ধু পাওয়া।
কালেজ মানে ক্যান্টিনের চা - সিঙ্গাড়া আর বন্ধুরা,
কলেজ মানে আলাপন রুমে আড্ডা দেওয়া।
কলেজ মানে সমস্ত খুশির উপভোগ করা।

মহাবিদ্যালয়ের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা

পার্বতী মাইতি
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

আধো উল্লাস ও আধো সংশয়ের মাঝে,
করিনু পদার্পণ শিক্ষার্থীর সাজে।
শূন্য জ্ঞানভান্ডারটিকে পূর্ণ করিতে,
মহাবিদ্যালয় সর্বদা চায় জ্ঞান ঢালিতে।
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মনোরম পরিবেশ,
নিজেকে মেলিয়া ধরিতে চাই শিক্ষার আদর্শে।
এই মহাবিদ্যালয়ে কি কহিব হায়!
এতই শ্রদ্ধা, এতই স্নেহ কি-বা নাই তায়!
অজানাকে জানিবার ক্ষুধা নিবৃত্তিতে,
নির্বাচন করিনু এই প্রতিষ্ঠানটিকে।
মন্দির তুল্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরূপী দেবতাগণ—
সর্বদাই আলোড়িত করে মোদের মন।
প্রবীন বিদ্যালয়ের স্মৃতি আসে ভাসিয়া,
মহাবিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ দিয়া।
সাফল্যের জনসমুদ্রের জয় মম সুনিশ্চয় ভাবিয়া,
অগ্রসর হইতে চাই প্রাচীন প্রস্তর ভেদিয়া।
মুখে শুধু একটাই ধ্বনি;
"এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও
ব্যর্থ হয়ে পিছু নাহি চাও।"
এই হলো মোর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা,
পরবর্তীদের দিয়ে যাই শিক্ষার আলোক বার্তা।।

আলো

সুপ্রীতি দাস
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

আলো তুমি কাছে এলে
আমার সমস্ত দুঃখ,
চলে যায় সুনীল আকাশের দিকে।
পাখির মতো পাখা মেলে আসতো যখন
সূর্যের পবিত্র কিরনে তুমি,
ভেসে ভেসে আসো যখন
সুন্দরের উপমায়,
সেই অপরূপ কিরনে তোমাকে মানায়
তোমার পবিত্রতায়,
ভোরে ওঠে প্রকৃতি
রূপালী কিরন নেমে আসে যখন প্রকৃতির গায়ে
এই আনন্দ-উল্লাসের মাঝখানে
শুভ্র প্রদীপের ন্যায়
তখন মনে হয় দোষ নেই
কোন কিছুতে।
এই আনন্দের মাঝখানে
তবু দিন চলে যায় রাত চলে আসে
এত আলো আকাশে
এত আলো বাতাসে।।

"এমন ও কোনো দিন যায়নি"

রাহুল প্রামানিক
বি. এসসি. প্রথম বর্ষ

(১)
এমনও কোনো দিন যায়নি, তোর কথা আমি ভাবিনি...
এমনও কোনো রাত যায়নি, তোর সাথে আমি কথা বলিনি...
এমনও কোনো দিন যায়নি, তোর কথা আমি ভাবিনি...
এমনও কোনো রাত যায়নি, তোর সাথে আমি কথা বলিনি...
হ্যাঁ ভাবায় সেই দিন, সেই দিন ছিল রঙ্গিন
হুম... ভাবায় সেই দিন, সেই দিন ছিল রঙ্গিন
আর ভাবতে চোখে আসে জল, তুই কেন চলে গেলি আমায় বল
তুই কেন চলে গেলি আমায় বল...
এমন ও কোনো দিন যায়নি, তোর কথা আমি ভাবিনি...
(২)
একদিন তোর পেতে দেখা, গিয়েছি একা, সব সীমানা পেরিয়ে...
হুম... বুঝিনি তখন, কী হবে যখন, তোকে হারিয়ে...
একদিন তোর পেতে দেখা, গিয়েছি একা, সব সীমানা পেরিয়ে...
হুম.. বুঝিনি তখন, কী হবে যখন, তোকে হারিয়ে...
পারছি না আর কী করি বল...
একবার তুই আমার সাথে চল
পারছি না আর কী করি বল
একবার তুই আমার সাথে চল
আমার সাথে চলে...
এমনও কোনো দিন যায় নি, তোর কথা আমি ভাবিনি...
এমনও কোনো রাত যায়নি, তোর সাথে আমি কথা বলিনি...
(৩)
বৃষ্টি ভেজা দিনে, তোর কথা শুনে, যাচ্ছি দিন গুনে...
আসবি কবে তুই, বাসবি কবে তুই, তা ভাবছি গোপনে...
হুম... বৃষ্টি ভেজা দিনে, তোর কথা শুনে যাচ্ছি দিন গুনে...
আসবি কবে তুই, বাসবি কবে তুই, তা ভাবছি গোপনে...
পারছি না আর সাথে তুই চল...
এইগান আমি কাকে শোনাই বল
হুম... পারছিনা আর সাথে তুই চল...
এই গান আমি কাকে শোনাই বল...
কাকে শোনাই বল...
এমনও কোনো দিন যায়নি, তোর কথা আমি ভাবিনি...
এমনও কোনো রাত যায় নি, তোর সাথে আমি কথা বলি নি...

কবিতা লেখার শখ

অনিমা দাস
সোসিওলজি, প্রথম বর্ষ

কবিতা লেখার শখটা আমার
অনেক দিনের ছিল।।
আজকে হঠাৎ লিখতে গিয়ে
গোল পাকিয়ে গেল।।
রাগের চোটে খাতা কলম
দিলাম নীচে ফেলে।।
পেনটা গিয়ে পড়ে গেল
এক বালতি জলে।।
হঠাৎ দেখি স্বপ্নে আমি
কবি হয়েছি।।
রবীন্দ্রনাথ এসে বলেন—
তোমার সঙ্গে আছি।।
মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙেছে
চমকে উঠে দেখি।।
স্কুল যাইনি বলে যে মা
করছে বকাবকি।।

ব্যর্থ ভালোবাসা

ত্রিয়াশা সামন্ত
সংস্কৃত বিভাগ

মনে পড়ে—
সে দিনের সেই শান্ত, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
না, অন্য কেউনা, তুমি এসেছিলে
হৃদয় কপাট উত্থাসিত করে
মোর স্মরনের পথে।
প্রকৃতির বুকে লালন লালিত চিত্তে
শিশু সম ছিনু শুয়ে।
একে একে মনে এল তোমার মুখ
অতল কালো অতনু আঁখি।
মিষ্টি মধুর আলতা রাঙা হাসি
প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলাম
সে দিন তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে স্কুলের গেটে
সুন্দর এক শাড়ী পরে
গোলাপের মত রঙ
পাকা ডালিমের মত ঠোঁট পদ্মসম আঁখি
সন্ধ্যার প্রথম তারার মতো স্নিগ্ধ ও অপরূপ
তোমার অতল কালো অতনু আঁখিতে
তারকার হিমদিপ্তি ভরে
তাকালে আমার মুখ পানে।
পারিনি থাকিতে মুগ্ধ অপলক নয়নে।
বার বার তাকিয়েছি তোমার মুখপানে
তোমার মনভোলা রূপ—
বার বার অনুভব করেছি
এক রাশ স্বপ্ন সুখ—
তোমার ঠোঁটের রক্তিম রেখায়
কাজল টানা পদ্মসম চোখের কিনারে,
আর ক্লান্তি জড়ানো নেতিয়ে পড়া
নিটোল দেহের ভাঁজে ভাঁজে
আমারই মনে সাজিয়েছি তোমায়
তোমার ও মনভোলা রূপ
আমার যৌবন বনে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন
সেই আগুন আজ ও প্রবাহিত
তনুতে তনুতে, শিরায় উপশিরায়,
জানি ব্যর্থ ভালোবাসা
না বুঝে তোমার মন, নিজের মনে
জমিয়েছি কত ভুলের জঞ্জাল
কিন্তু আজ কোথা তুমি, কোথা আমি
মাঝে শূন্যতা অগাধ
মাঝে মাঝে মনে হয়
ভুলে যাই তোমাকে, কিন্তু না—
তোমায় ভুলে থাকা, সে তো সুন্দরের অবস্থান
জানি এ পৃথিবীতে কিছুই রবেনা।
সব মহাশূন্যতায় ক্ষয়ে যায়
তোমার স্মৃতিও হয়তো সেইমতো হারাবে ধূলায়
কিন্তু আমি ভুলবোনা
তোমাকে ভালোবেসে পূর্ণ আমি।
শুধু এই কথাটুকু অন্তরে জেলে রাখি
হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
তুমি ছিলে
তবু তুমি ছিলে।

BE A FRIEND

Saheli Nayek
B. A. English Honors 1st Year

To be a friend to someone,
You don't need a high status.
All you need is to give up –
A piece of your smile;
To comfort her baby – pink lips.

To be a friend to someone,
You don't need to be a millionaire.
All you need is to give up –
A piece of your scheduled time;
To calm her stressful life.

To be a friend to someone,
You don't need to be talented.
All you need is to give up –
A piece of your heart;
To help he built her cozy apace.

To be a friend to someone,
You don't need to be beautiful.
All you need is to give up –
A piece of your inner grace;
To make your friendship a treasure.

To be a friend to someone,
You don't need to find profits.
All you need is to give up –
A piece of your commitment;
To be friends, lasting forever.

Divine Love

Debika Basu
English Honors, 1st Semester

Resting myself upon the grass;
As the river flows by my side,
I have a glimpse of my majesty.
That someone, so near –
Yes, I have fallen in love.
Love with you, Oh God!
Love with the mature you created
Love with these beautiful creatures
You have carved,
With all your anxiety.
I feel you everywhere,
Here and There.
Even in the breeze that floats by –
Tilling up my heart with all happiness.
Oh! Al – Mighty, Oh! My Divine love.
Such an ecstasy I feel, Oh God.

At the end of brightness;
As I rest my eyes, collapsing
Totally exhausted.
The fears in me finds its' existence!
I feel like left, all alone –
And sudden peeping of the silvery moon
Behind those grey clouds.
Reminds me of that feeling,
As if you were near.
Caressing my tired body,
Embracing my heart;
Calms and comforts it.
Then slowly, I close my eyes
Waiting for a new day – break –
Waiting to fall in love with you,
All our again.

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০১৮

● রবীন্দ্র সঙ্গীত

প্রথম ঃ— অয়ন্তিকা মাল I/C 3rd Year
দ্বিতীয় ঃ— অনুভব মন্ডল
তৃতীয় ঃ— পারিজাত প্রধান B. Sc. (H) 3rd Sem
মৌসুমি ঘোড়াই B. Sc. (H) 3rd Sem

● নজরুল সঙ্গীত

প্রথম ঃ— অয়ন্তিকা পাল I/C 3rd year
দ্বিতীয় ঃ— পারিজাত প্রধান B.Sc. (H) 3rd Sem
তৃতীয় ঃ— সৌম্যদ্বীপ দাস B.A. (H) 1st Sem
সুস্মিতা সামন্ত B. Sc. (H) 3rd Sem

● আধুনিক সঙ্গীত

প্রথম ঃ— পারিজাত প্রধান
দ্বিতীয় ঃ— অয়ন্তিকা পাল
তৃতীয় ঃ— নবনিতা পাল

● লোক সঙ্গীত

প্রথম ঃ— পারিজাত প্রধান
দ্বিতীয় ঃ— মৌসুমি ঘোড়াই
তৃতীয় ঃ— সৌম্যদ্বীপ দাস

● রবীন্দ্র নৃত্য

প্রথম ঃ— মৈত্রেয়ী মন্ডল + মৌমিতা মাইতি
দ্বিতীয় ঃ— সীমা প্রামানিক
তৃতীয় ঃ— রিয়া মিশ্র

● আধুনিক নৃত্য

প্রথম ঃ— মৈত্রেয়ী মন্ডল
দ্বিতীয় ঃ— অস্মিতা ব্যবর্ত্তা
তৃতীয় ঃ— পিংলা বেতাল

● লোক নৃত্য

প্রথম ঃ— মৈত্রেয়ী মন্ডল + রিয়া মিশ্র
দ্বিতীয় ঃ— স্বস্তীকা মন্ডল
তৃতীয় ঃ— তনুশ্রী মাইতি

● মুকাভিনয়

প্রথম ঃ— সব্যসাচী পন্ডা
দ্বিতীয় ঃ— প্রীতম হাজরা
তৃতীয় ঃ— দেবাশিষ আচার্য্য

হরবোলা

প্রথম ঃ— রাজু মাইতি
দ্বিতীয় ঃ— প্রকাশ পাল + প্রীতম হাজরা
তৃতীয় ঃ— সব্যসাচী পন্ডা

● রবীন্দ্র আবৃত্তি

প্রথম ঃ— সুপর্না রাউৎ
দ্বিতীয় ঃ— সত্যজিৎ বর
তৃতীয় ঃ— সমর্পিতা ভৌমিক
অর্পিতা ঘোড়ই

● আধুনিক আবৃত্তি

প্রথম ঃ— সুপর্না রাউৎ
দ্বিতীয় ঃ— সমর্পিতা ভৌমিক
তৃতীয় ঃ— রিয়া মিশ্র

● দ্বৈত কবিতা পাঠ

প্রথম ঃ— সুপর্না রাউৎ
অনামিকা হাজারা
দ্বিতীয় ঃ— সুরেখা চৌধুরী
সমর্পিতা ভৌমিক
তৃতীয় ঃ— রিয়া মিশ্র
সুমনা পানিগ্রাহী

বিজ্ঞান পরিষদীয় প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০১৮

● রঙ্গোলী

প্রথম ঃ— সাথী জানা English 1st
দ্বিতীয় ঃ— অস্মিতা ব্যবর্ত্তা 1st Sem Mathematics
তৃতীয় ঃ— মোনালিসা বেরা 1st Sem Bengali

● **Inter Class Quiz Compitition**

প্রথম ঃ— সৌরিন জানা 2nd year, Chemistry
সেক রেজাউল আলম
কৌশিক ভট্টাচার্য্য 1st Sem, History
দ্বিতীয় ঃ— অনিন্দ্য দাস 3rd Sem Chemistry
শঙ্খশুভ্র মাইতি 3rd Sem Chemistry
উৎসব দাস 3rd Sem Chemistry
তৃতীয় ঃ— অঙ্কন ম্যাটলা 3rd Sem Phisics
অমিত প্রধান 3rd Sem Phisics
সৌরভ কুমার সামন্ত 3rd Sem Phisics

● বিতর্ক

প্রথম ঃ— রিয়া মিশ্র M.A. English
দ্বিতীয় ঃ— অঙ্কন মেটলা 3rd Sem Physics
তৃতীয় ঃ— শুভ্রজ্যোতি পন্ডা 1st Sem Math

● অঙ্কন

প্রথম ঃ— প্রিতি সাঁতরা 1st Sem Philosophy
দ্বিতীয় ঃ— সাহেব জানা 1st Sem Comp. Science
তৃতীয় ঃ— তনুশ্রী মান্না B. Sc. (H) Geography
ও বীথি বেরা B. Sc. (H) Zoology

● সংবাদ পাঠ

প্রথম ঃ— পারমিতা আচার্য্য 1st Sem English
দ্বিতীয় ঃ— শুভ্রজ্যোতি পন্ডা 1st Sem Math
তৃতীয় ঃ— অঙ্কন মেটলা 3rd Sem Physics

● তাৎক্ষনিক বক্তব্য

প্রথম ঃ— অঙ্কন মেটলা 3rd Sem Physics
দ্বিতীয় ঃ— সমর্পিতা ভৌমিক 3rd Sem Zoology
তৃতীয় ঃ— মৌসুমী ঘোড়াই 3rd Sem Zoology

Result of Annual Atheletic & Sports - 2018

• 100M Sprint (Male)
1st : Surajit Samanta
2nd : Sandip Roy
3rd : Sk. Muslam Ali

• 100M Sprint (Female)
1st : Parama Yadav
2nd : Ranita Roy
3rd : Sucheta Mabhai

• 200M Sprint (Male)
1st : Basudeb Dutta Sharma
2nd : Surajit Samanta
3rd : Sandip Manna

• 200M Sprint (Female)
1st : Parama Yadav
2nd : Ranita Roy
3rd : Sangita Barh

• 400M Sprint (Male)
1st : Sanju Maiti
2nd : Suman Patra
3rd : Sandip Manna

• 400M Sprint (Female)
1st : Parama Yadav
2nd : Piyali Saska
3rd : Urmila Bhunia

• 800M Sprint (Male)
1st : Sanju Maiti
2nd : Manindranath Metya
3rd : Suman Patra

• 800M Sprint (Female)
1st : Piyali Saska
2nd : Urmila Bhunia
3rd : Subhra Jana

• 1600M Run (Male)
1st : Sanju Maiti
2nd : Manindranath Metya
3rd : Suman Patra

• 1600M Run (Female)
1st : Piyali Saska
2nd : Anurupa Pradhan
3rd : Urmila Bhunia

• Realy Race (4x100)(Male)
1st : Surajit Samanta & Team
2nd : Sk. Muslam Ali & Team
3rd : Sabyasachi Panda & Team

• Realy Race (4x100)(Female)
1st : ----- & Team
2nd : Sk. Muslam Ali & Team
3rd : Sabyasachi Panda & Team

• Long Jump (Male)
1st : Surandra Murmu
2nd : Soumitra Bijali
3rd : Santanu Bera

• Long Jump (Female)
1st : Monalisha Maiti
2nd : Anupama Pradhan
3rd : Sucheta Mabhai

• High Jump (Male)
1st : Santanu Bera
2nd : Sabyasachi Panda
3rd : M.D. Hasim

• High Jump (Female)
1st : Monalisha Manna
2nd : Suchata Mabhai
3rd : Salima Khatun

Result of Annual Atheletic & Sports - 2018

• Shot Put (Male)

1st : Subham Alu
2nd : Shaymal Ari
3rd : Debasish Achariya

• Shot Put (Female)

1st : Kajal Khatun
2nd : Monisha Sau
3rd : Monalisha Manna

• Discus Throw (Male)

1st : Shaymal Ari
2nd : Sk. Muslem Ali
3rd : Debasish Acharya

• Discus Throw (Female)

1st : Monisha Sau
2nd : Kajal Khatun
3rd : Shyamashree Manna

• Javelin Throw (Male)

1st : Arijit Samanta
2nd : Sabyasachi Panda
3rd : Sanju Mandal

• Javelin Throw (Female)

1st : Kakali Paria
2nd : Manisha Sau
3rd : Anamika Maiti

• Musical Chair (Female)

1st : Kakali Paria
2nd : Bitisha Samanta
3rd : Falguni Bera

• Shot Put (Staff)

1st : Sandip Mishra
2nd : Debasish Saska
3rd : Goutam Pradhan

• Shot Put (Ex. Students))

1st : Sk. Rejaul Alam
2nd : Rohit Mondal
3rd : Ashirbad Adak

• Slow Cycle Race (Fale)

1st : Sk. Muslem Ali
2nd : Subhasish Seth
3rd : Sukirti Mandal

INTER CLASS FOOTBALL COMPETITION 2018

Champion - 1st Sem

Name of Players :

1) Joymalya Samanta
2) Subhasis Seth
3) Rahul Pramanik
4) Sonojit Paul
5) Sougata Singha
6) Swapan Biswas
7) Subhadeep Ghati
8) Sk. Hasim
9) Rohimul Islam
10) Sukhendu Ghara
11) Tathagata Pradhan

Extra :

12) Kapildeb Pradhan
13) Prasenjit Giri
14) Sudip Manna
15) Soumyadip Panda

Runners - B.A. 1st Year

Name of Players :

1) Sohan Bhunia
2) Bapan Barui
3) Nandan Mondal
4) Nirupam Mistri
5) Arjun Hansda
6) Niladri Mondal
7) Souman Bhattacharya
8) Rabin Maiti
9) Dibyendu Banerjee
10) Prakash Paul
11) Sabyasachi Panda

Extra :

12) Prasanta Bera
13) Debasish Acharya
14) Sk. Firoz

মহিষাদল রাজ কলেজ পত্রিকা - ২০১৭-২০১৮

বিগত বর্ষপত্র সম্পাদকগণের তালিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকা	ছাত্রছাত্রী
'৭৩-৭৪ —অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	ভোলানাথ সামন্ত
'৭৫-৭৬ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	মানসী আচার্য
'৭৬-৭৭ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	? ?
'৭৭-৭৮ —অধ্যাপক তাপস মুখোপাধ্যায়	অমল দাস
'৭৮-৭৯ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	অসিত কুমার মাইতি
'৮০-৮১ —অধ্যক্ষ বিভূতি ভূষণ সেন	স্বপন কুমার দাস
'৮১-৮২ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	কল্যাণ কুমার মাইতি
'৮২-৮৩ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	শোভন কুমার মাইতি
'৮৩-৮৪ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	নিশীথ কুমার জানা
'৮৪-৮৫ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	নেপাল মেটা
'৮৫-৮৬ — অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র মাইতি	দিপালী অধিকারী
'৮৬-৮৭ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	পূর্ণেন্দু জানা
'৮৭-৮৮ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	তাপস দাস
'৮৮-৮৯ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	সীতেশ দাস
'৮৯-৯০— অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	দেবাশীষ সামন্ত
'৯০-৯১ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	প্রণব সামন্ত
'৯১-৯২ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম	দেবাশীষ গায়েন
'৯২ ৯৩ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম	অস্মিতা খাঁড়া
'৯৩-৯৪ —অধ্যাপক তপন কুমার সাহু	আশিষ গায়েন
'৯৪-৯৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	আশিস খাঁড়া
'৯৫- ৯৬ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	শীলা পাত্র
'৯৬-৯৭ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী	লালবাহাদুর বিজলী
'৯৭-৯৮ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী	কমল পারিয়াল
'৯৯-২০০ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	উত্তম কুমার পাল
২০০০-২০০১ — প্রভাস কুমার রায়	সাথী দাস
২০০১-২০০২ —অধ্যাপক শুভময় দাস	পবিত্র সাহু
২০০২-২০০৩— অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি	সর্বেশ্বর মল্লিক
২০০৩-২০০৪ — অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি	গোপাল বেজ
২০০৪-২০০৫ —অধ্যাপক শুভময় দাস	কাবেরি শর্মা
২০০৫-২০০৬ — আশীষ দে	মৌমিতা বেরা
২০০৬-২০০৭ — অধ্যাপিকা শ্যামা জানা (গিরি)	প্রিয়াংকা দাস
২০০৭-২০০৮ — ,, শ্যামা জানা (গিরি)	যুথিকা দাস
২০০৮-২০০৯ — অধ্যাপক ডঃ শেখর ভৌমিক	প্রসেনজিৎ মান্না
২০০৯-২০১০ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	শুভ মাইতি
২০১০-২০১১ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	নাগমা খাতুন
২০১১-২০১২ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	অতনু জানা
২০১২-২০১৩ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	মমতা বারিক
২০১৩-২০১৪ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	বিমল মাইতি
২০১৪-২০১৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	গোপাল রাণা
২০১৬-২০১৭ — অধ্যাপক শুমিপর্ণা মাইতি	বাপ্পাদিত্য বেরা
২০১৭-২০১৮ — অধ্যাপক শুভময় দাস	সায়ন আচার্য্য (বর্তমান বৎসর)

ছাত্র সংসদ

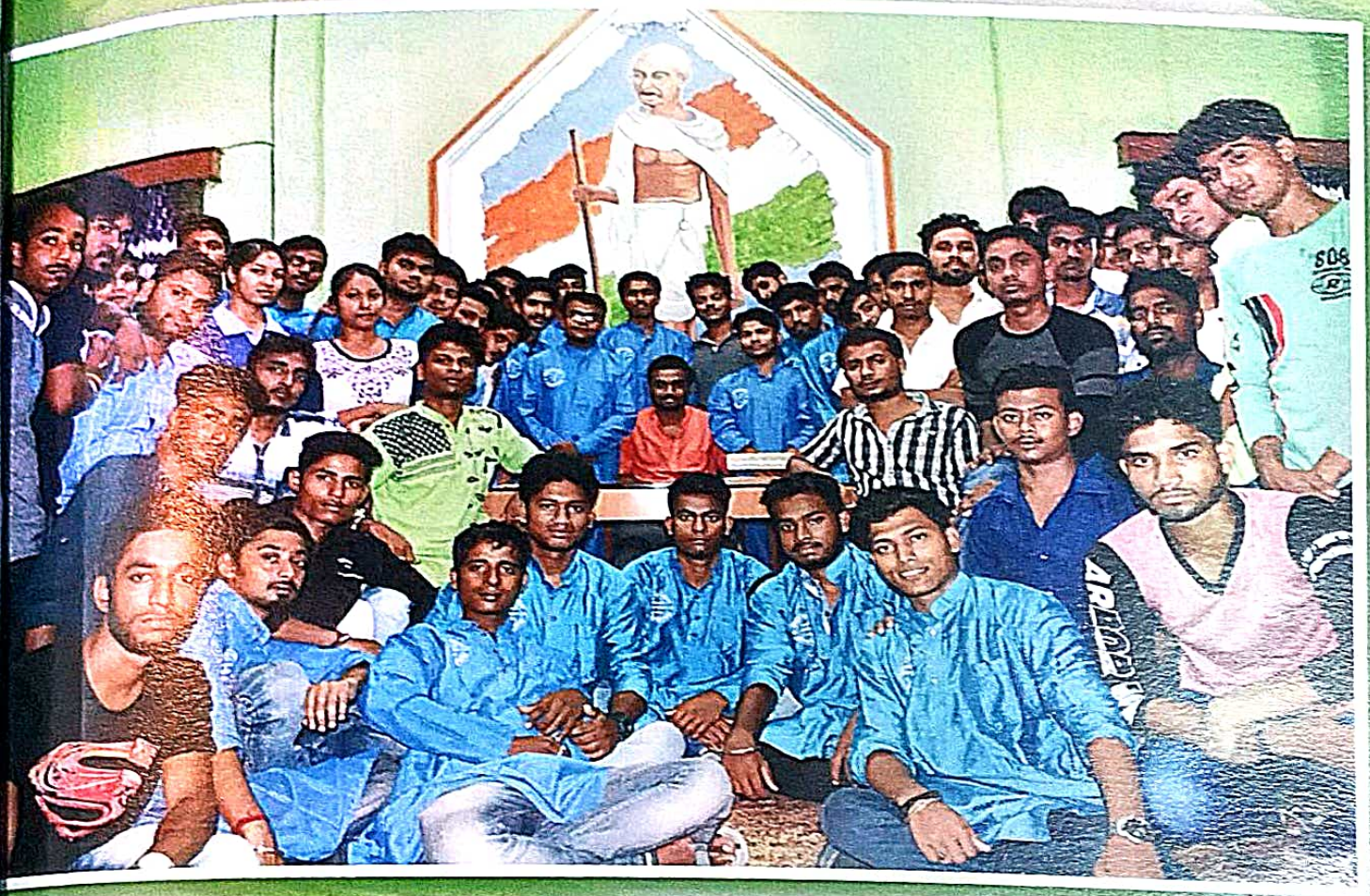

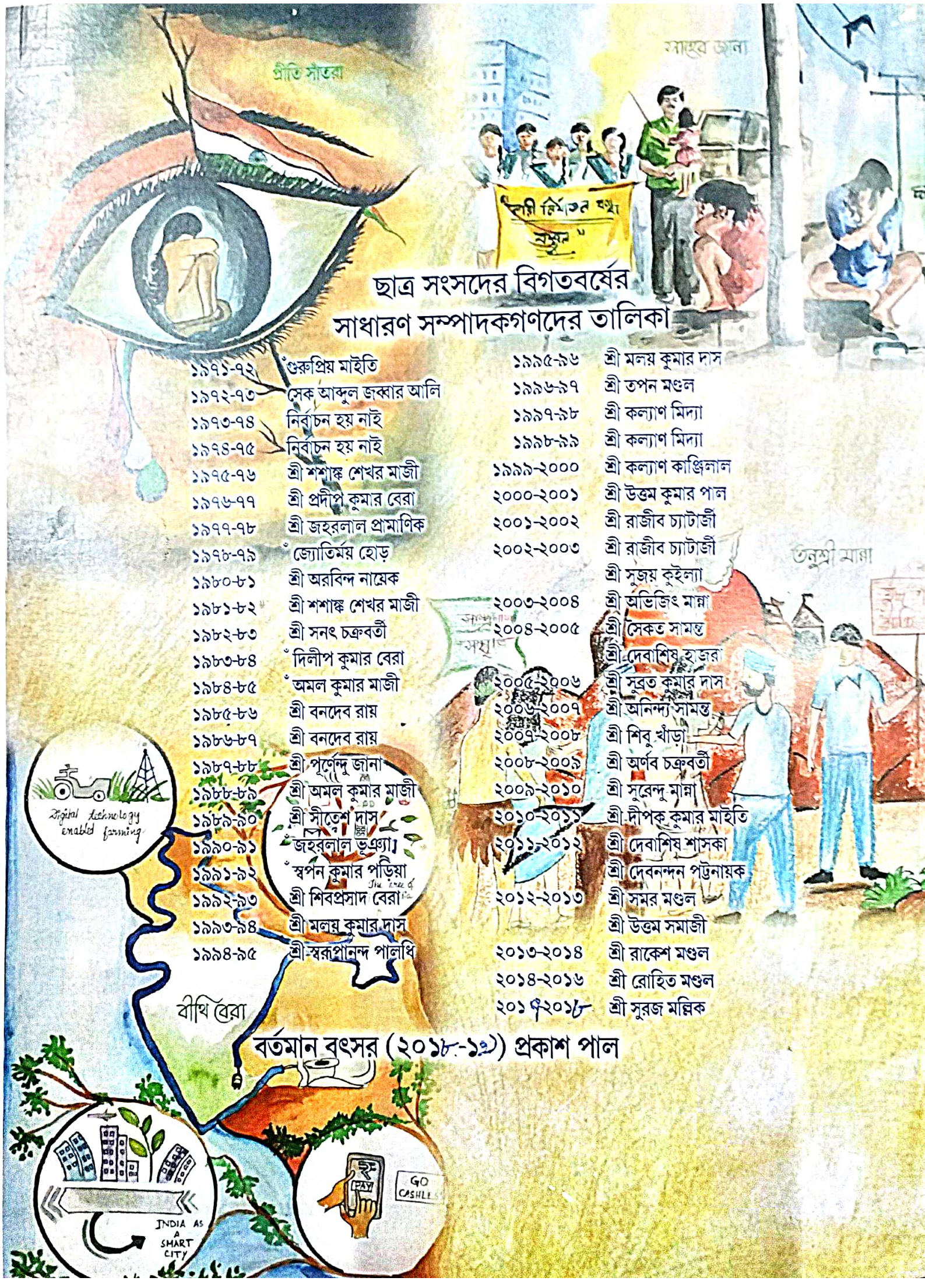

ছাত্র সংসদের বিগতবর্ষের সাধারণ সম্পাদকগণদের তালিকা

১৯৭১-৭২	গুরুপ্রিয় মাইতি
১৯৭২-৭৩	সেক আব্দুল জব্বার আলি
১৯৭৩-৭৪	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৪-৭৫	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৫-৭৬	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৭৬-৭৭	শ্রী প্রদীপ কুমার বেরা
১৯৭৭-৭৮	শ্রী জহরলাল প্রামাণিক
১৯৭৮-৭৯	জ্যোতির্ময় হোড়
১৯৮০-৮১	শ্রী অরবিন্দ নায়েক
১৯৮১-৮২	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৮২-৮৩	শ্রী সনৎ চক্রবর্তী
১৯৮৩-৮৪	দিলীপ কুমার বেরা
১৯৮৪-৮৫	অমল কুমার মাজী
১৯৮৫-৮৬	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৬-৮৭	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৭-৮৮	শ্রী পূর্ণেন্দু জানা
১৯৮৮-৮৯	শ্রী অমল কুমার মাজী
১৯৮৯-৯০	শ্রী সীতেশ দাস
১৯৯০-৯১	জহরলাল ভূঞ্যা
১৯৯১-৯২	স্বপন কুমার পড়িয়া
১৯৯২-৯৩	শ্রী শিবপ্রসাদ বেরা
১৯৯৩-৯৪	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৪-৯৫	শ্রী স্বরূপানন্দ পালধি
১৯৯৫-৯৬	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৬-৯৭	শ্রী তপন মণ্ডল
১৯৯৭-৯৮	শ্রী কল্যাণ মিদ্যা
১৯৯৮-৯৯	শ্রী কল্যাণ মিদ্যা
১৯৯৯-২০০০	শ্রী কল্যাণ কাঞ্জিলাল
২০০০-২০০১	শ্রী উত্তম কুমার পাল
২০০১-২০০২	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী
২০০২-২০০৩	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী শ্রী সুজয় কুইল্যা
২০০৩-২০০৪	শ্রী অভিজিৎ মান্না
২০০৪-২০০৫	শ্রী সৈকত সামন্ত শ্রী দেবাশিষ হাজরা
২০০৫-২০০৬	শ্রী সুব্রত কুমার দাস
২০০৬-২০০৭	শ্রী অনিন্দ্য সামন্ত
২০০৭-২০০৮	শ্রী শিবু খাঁড়া
২০০৮-২০০৯	শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী
২০০৯-২০১০	শ্রী সুরেন্দু মান্না
২০১০-২০১১	শ্রী দীপক কুমার মাইতি
২০১১-২০১২	শ্রী দেবাশিষ শাসকা
	শ্রী দেবনন্দন পট্টনায়ক
২০১২-২০১৩	শ্রী সমর মণ্ডল শ্রী উত্তম সমাজী
২০১৩-২০১৪	শ্রী রাকেশ মণ্ডল
২০১৪-২০১৬	শ্রী রোহিত মণ্ডল
২০১৬-২০১৮	শ্রী সুরজ মল্লিক

বর্তমান বৎসর (২০১৮-১৯) প্রকাশ পাল